নবদিশা

শিক্ষাঙ্গনে নতুন দিশার সন্ধানে

সংকলন ৯। ■ মার্চ ২০১৫

নবদিশা

শিক্ষাঙ্গনে নতুন দিশার সন্ধানে

সংকলন - ৯ । এপ্রিল ২০১৫

সম্পাদকীয়

সৃজনশীলতার মুক্ত আকাশ

মানুষ জন্মগত ভাবেই সৃজনশীল। আমাদের এই বিজ্ঞান সভ্যতা হল সেই সৃজনশীলতারই চূড়ান্ত রূপ। এই সৃজনশীলতাই আমাদের মানব সভ্যতাকে চূড়ান্ত উন্নতির শিখরে পৌঁছে দিয়েছে। কিন্তু ব্যাপকভাবে সাধারণ মানুষের পক্ষে সেই সৃজনশীলতার উপযুক্ত বহিঃপ্রকাশ নানা কারণেই অসম্ভব হয়ে পড়ে। এখন গতানুগতিক শিক্ষা পদ্ধতির বাইরে বিকল্প শিক্ষা ব্যবস্থা তথা পদ্ধতির মাধ্যমে সৃজনশীলতার মুক্ত আকাশে আমাদের শিশুদের কিভাবে অনুপ্রাণিত করা যায়, তা নিয়েই আমাদের এই প্রয়াস। প্রকৃতপক্ষে আমরা রবীন্দ্রনাথ কথিত চার দেওয়ালের শিক্ষা কারখানার বাইরে বেরিয়ে এসে শিক্ষাকে ছাত্র ছাত্রীদের সংশ্লিষ্ট এলাকার নিজস্ব জীবন-যাপন ও প্রকৃতির সঙ্গে সংযোগ ঘটাতে চাই। রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় এই মুক্ত শিক্ষা ছাত্রছাত্রীদের চেতনা ও মূল্যবোধকে যেমন প্রসারিত করে, তেমনি পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির সাথে সাথে তাদের সৃজনশীলতাকেও জাগিয়ে তোলে।অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা দর্শন অনুযায়ী শিশুদের মধ্যে সৃজনশীলতার যে বীজ লুক্কায়িত রয়েছে, সেই বীজের অঙ্কুরোদ্গমের কথা বলা হয়েছে। এখন সৃজনশীলতা বলতে কি বোঝায়, তা নিয়ে প্রথমেই বলতে হয় যে মেধা ও সৃজনশীলতা কখনই এক নয়, কিন্তু সৃজনশীলতা যে মেধার বিকাশে সহায়ক হয়ে ওঠে তা অস্বীকার করা যায় না। এই সৃজনশীলতা হল ছাত্রছাত্রীদের তথা শিশুদের নিজস্ব সহজাত বোধ ও গুণগুলির এক অনবদ্য মিশেল। এই সহজাত বোধ ও গুণগুলির প্রকাশ এবং সেগুলির উপযুক্ত প্রয়োগের মধ্য দিয়েই সৃজনশীলতার যথাযথ বহিঃপ্রকাশ। আর সৃজনশীলতার এই উপযুক্ত বহিঃপ্রকাশের কামনায় তথাকথিত শিক্ষা কারখানার বিপরীত মেরুতেই নব দিশার অবস্থান।

সূচীপত্র

১। বিদ্যালয় সৃজনশীলতাকে ধ্বংস করে ১

২। বর্তমানে নঈ তালিমঃ কিছু সমস্যা এবং সম্ভাবনা ৫

৩। বিষয়ঃ প্রাথমিক শিক্ষায় অডিও-ভিসুয়ালের..... ৭

৪। আমার গ্রাম ও আমার গ্রামের ইতিহাস ৮

৫। সেই সময় - জলপাইগুড়ি ৯

৬। আমাদের গ্রাম ১২

৭। পুস্তক পরিচিতি ১৩

৮। বিখ্যাত চিন্তাবিদদের ভাবনায় শিক্ষাঃ পাওলো ফ্রেইরী ১৫

৯। এসো তাঁদের গল্প শোনাইঃ বিদ্যাসাগর ১৭

১০। স্কুলেই কাজ শিখে রোজগার..... ১৮

১১। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রাচীন-ভারতের..... ১৯

১২। একজন সৃষ্টিশীল শিক্ষিকা ও আমেরিকার গ্রামে.. ২০

১৩। কালের বিবর্তণে হারিয়ে যাচ্ছে গ্রাম বাংলার..... ২১

১৪। সৃজনের বিকাশে সৃজনের মেলা..... ২২

১৫। বালুরঘাট পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে..... ২৩

১৬। প্রাসঙ্গিক শিক্ষার বিস্তারে ভ্রমণের প্রাসঙ্গিকতা ২৪

১৭। বিদ্যালয়সমূহের নতুন পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী..... ২৫

১৮। কৃত্যালি যখন জ্ঞান গঠনের আবাসভূমি ২৭

বিদ্যালয় সৃজনশীলতাকে ধ্বংস করে

স্যার কেন রবিনসন শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নতির জন্য দীর্ঘদিন কাজ করছেন। কেন রবিনসন ২০০৬ সালে টেডএক্স সম্মেলনে সৃজনশীলতা বিষয়ে একটি চমৎকার ভাষণ দেন। সেখানে তিনি বলতে চেয়েছেন যে বিদ্যালয় সৃজনশীলতাকে ধ্বংস করে এবং এই ব্যবস্থার পরিবর্তন প্রয়োজন। স্যর কেন রবিনসনের এই মতামত সৃজনশীলতাকে জাগিয়ে তোলার প্রক্রিয়াকেই নির্দেশ করে।

পাঠকদের জন্য টেডএক্স সম্মেলনে দেওয়া স্যার রবিনসনের ভাষণের গুরুত্বপূর্ণ অংশ এখানে অনুবাদ করা হলো।

শুভ সকাল। কেমন আছেন আপনারা? সময়টা খুব ভাল গেছে এখানে, তাই না? আমি এই পুরো ব্যাপারটা নিয়ে আমি অপার্থিব মজা পেয়েছি। এমনকি দেখুন, আমি চলেই যাচ্ছি! এই আলোচনাসভায় আরো তিনটি বিষয়বস্তু ছিল, তাই না, যেগুলো আলোচিত হয়েছে, এর সাথে সম্পর্কযুক্ত একটা বিষয় নিয়ে আমি এখন কথা বলতে চাই। একটা হচ্ছে মানুষের সৃজনশীলতার অসাধারণ একটি প্রমাণ, যা এখানকার সব উপস্থাপনার মধ্যে এবং সব মানুষের মধ্যে দেখা যাচ্ছে। দেখুন বিভিন্ন এই ব্যাপারগুলো আর এর বিস্তৃতি। দ্বিতীয়টা হচ্ছে এটা আমাদেরকে এমনি এক জায়গায় নিয়ে এসেছে যে আমরা জানি না কী ঘটতে যাচ্ছে, ভবিষ্যৎ নিয়ে বলছি আর কি। কোন ধারণা নেই এটা কোথায় গিয়ে শেষ হবে।

আমার শিক্ষা বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ আছে -- আসলে কি, আমি দেখি যে সবারই শিক্ষা নিয়ে আগ্রহ আছে। আপনি কি বলেন? আমি এটাতে অনেক মজা পাই। আপনি যদি কোথাও রাতের খাবারের নিমন্ত্রণে যান এবং বলেন যে, আপনি শিক্ষা নিয়ে কাজ করেন -- অবশ্য, আপনি অধিকাংশ সময়ই রাতের খাওয়ার নিমন্ত্রণে থাকেন না, যদি আপনি শিক্ষা নিয়ে কাজ করেন। আপনাকে জিজ্ঞেস করা হয় না। এবং উৎসাহী হয়ে আপনাকে কেউ উলটো জিজ্ঞেসও করে না। এটা আমার কাছে অদ্ভুত লাগে। কিন্তু যদি জিজ্ঞেস করা হয়, এবং এটা যদি আপনি কাউকে বলেন, জানেনই তো, তারা হয়ত বলল "আপনি কি করেন?" এবং আপনি বললেন আপনি শিক্ষা নিয়ে কাজ করেন, আপনি দেখবেন তাদের মুখ একদম সাদা হয়ে যাবে। তারা বলবে, "হে ঈশ্বর! আমিই কেন?" পুরো সপ্তাহে এক রাতই আমি বের হয়েছি যা কিনা বরবাদ হয়ে গেল।" কিন্তু আপনি যদি তাদের শিক্ষার কথা জিজ্ঞেস করেন, তাহলে তারা আপনার পিঠ দেয়ালে ঠেকিয়ে দেবে। কারণ এটা সেসব জিনিসের মধ্যে একটা, যা নিয়ে সবার একটা গভীর চিন্তা থাকে, ঠিক না? যেমন ধর্ম, এবং টাকা-পয়সা এবং আরও কিছু জিনিস। শিক্ষা নিয়ে আমার বিশাল আগ্রহ, এবং আমার মনে হয় সবারই। এটার প্রতি আমরা এত গুরুত্ব দিচ্ছি খানিকটা এজন্য যে শিক্ষাই আমাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জানাতে পারে, যা আমরা এমনিতে ধরতে পারি না। যেমন চিন্তা করে দেখুন, এই বছর যেসব শিশু স্কুল শুরু করবে, তারা অবসর নেবে ২০৬৫ সালে। কারোর কোন ধারণাই নেই -- গত চারদিনে বিশেষজ্ঞদের ভাবনা সম্পর্কে জানা সত্ত্বেও, যে পৃথিবীটাকে কেমন দেখাবে সামনের পাঁচ বছরে। তবুও আমাদের তার জন্য শিশুদের শিক্ষা দিতে হবে। তাই এখানে পূর্বাভাস না পাওয়ার ব্যাপারটা আমি মনে করি, অস্বাভাবিক।

আর তৃতীয়টা হচ্ছে আমাদের সবার সম্মতি যে সত্যিকারেই কিছু অসাধারণ ক্ষমতা শিশুদের আছে -- যেমন তাদের নতুনত্বকে ধারণ করার ক্ষমতা। এই যেমন ধরুন গত রাতের সিরিনাকে; সে ছিল একটা চমক, তাই না? আমরা দেখেছি সে কি করতে পারে। এবং সে ব্যাতিক্রম, কিন্তু আমার তা মনে হয় না, অর্থাৎ পুরোটা শৈশবই সবার থেকে ব্যতিক্রম নয়। এখানে ব্যাপারটা হল অসাধারণ নিষ্ঠা, যার মাধ্যমে সে নিজের প্রতিভাকে খুঁজে পেয়েছে। আমার কাছে বিবাদের কথা হল, সব শিশুরই মুগ্ধ করার মত প্রতিভা আছে এবং আমরা সেগুলোকে খুব নিষ্ঠুরভাবে নষ্ট করি। তাই আমি শিক্ষা নিয়ে কথা বলতে চাই এবং সৃজনশীলতা নিয়ে কথা বলতে চাই। আমার কথা হল এখন শিক্ষাক্ষেত্রে সাক্ষরতার মত সৃজনশীলতা একই রকম গুরুত্বপূর্ণ এবং আমাদেরও উচিত এটাকে একই চোখে দেখা। ধন্যবাদ আপনাদের। এতটুকুই ছিল আমার কথা। অনেক ধন্যবাদ আপনাদের। যাইহোক এখনো ১৫ মিনিট বাকি। তো, আমি জন্ম নিলাম... আর... না...

সম্প্রতি খুব সুন্দর একটা গল্প শুনেছি -- সেটা বলতে আমার খুব ভাল লাগে -- গল্পটা ছয় বছরের এক ছোট্ট মেয়ের ছবি আঁকার ক্লাস নিয়ে। সেদিন সে পিছনে বসে ছবি আঁকছিল, তার শিক্ষিকা জানিয়েছেন, এমনিতে মেয়েটা কখনোই মনোযোগ দিত না, কিন্তু সেইদিন সে মনোযোগ দিচ্ছিল। শিক্ষিকা অভিভূত, তিনি মেয়েটার কাছে গেলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কী আঁকছ?" মেয়েটা উত্তর দিল, "আমি ঈশ্বরের ছবি আঁকছি।" শিক্ষিকা বললেন, "কিন্তু ঈশ্বর দেখতে কেমন, তা তো কেউ জানে না।" মেয়েটা বলল, "কয়েক মিনিট পরেই তারা জানতে পারবে।"

ইংল্যান্ডে, যখন আমার ছেলের বয়স চার ছিল -- সত্যি কথা বলতে, সবখানেই ওর বয়স চার ছিল। বলতে গেলে, ও

যেখানেই গেছে, ওর বয়স চারই ছিল প্রতি বছর। ও বড়দিনের নাটকে অভিনয় করেছিল। আপনাদের কাহিনীটা মনে আছে? না! কাহিনিটা বেশ বড়। মেল গিবসন ওটার সিকুয়াল নির্মাণ করেছেন। আপনারা হয়তো দেখেছেন: "ন্যাটিভিটি টু।" কিন্তু জোসেফের চরিত্রটা পেল জেমস, সেটা নিয়ে আমরা খুব শিহরিত ছিলাম। আমরা সেটাকে অন্যতম প্রধান চরিত্র বলে ভেবেছিলাম। পুরো জায়গাটা দর্শকে ঠাসাঠাসি হয়ে গিয়েছিল, টি শার্টে লেখা ছিলঃ "জেমস রবিনসন আজ জোসেফ!" ওকে কোন কথাই বলতে হয়নি, কিন্তু আপনারা তো জানেনই একটা সময় তিনজন রাজা আসেন। তারা উপহার সাথে আনেন, এবং আনেন সোনা, ফ্রাংকিনসেন্স (সুগন্ধি আঠা) আর ম্যার (সুগন্ধি নির্যাস)। এটা সত্যিই হয়েছিল। আমরা সেখানে বসে ছিলাম আর আমার মনে হল তখন ওরা পাট ভুলে গেছে, কারণ পরে আমরা ছোট্ট ছেলেটার সাথে কথা বললাম, জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি কি ঠিক আছ?" সে উত্তর দিল, "হ্যা, কেন? কিছু কি ভুল হয়েছে?" ওরা গুলিয়ে ফেলেছিল, ব্যস। যাক, তো সেই তিনটি ছেলে এল -- চার বছর বয়সী, মাথায় তোয়ালে পেঁচানো অবস্থায় -- তারা ওই বাক্সগুলোকে নিচে রাখলো, প্রথম ছেলেটা বলল, "আমি তোমার জন্য সোনা এনেছি।" দ্বিতীয় ছেলেটা বলল, "আমি তোমার জন্য ম্যার (সুগন্ধি নির্যাস) এনেছি।" আর তৃতীয় ছেলেটা বলল, "ফ্রাংক এটা পাঠিয়েছে"

শিশুদের মধ্যে এখানে সাধারণ একটা ব্যাপার হল, ওরা সুযোগ নেয়। ওরা যদি কিছু নাও জানে, তবুও ওরা তা চেষ্টা করে দেখে। ঠিক বলেছি? ওরা ভুল করাকে ভয় পায় না। আমি বলছি না যে ভুল করা আর সৃজনশীলতা একই কথা। আমরা যেটা জানি সেটা হল আপনি যদি ভুল করতে প্রস্তুত না থাকেন, তবে আপনি কখনোই মৌলিক কিছু করতে পারবেন না -- যদি ভুল করতে প্রস্তুত না থাকেন। আর যতদিনে এসব শিশুরা পূর্ণবয়স্ক হয়, অধিকাংশই এই ক্ষমতাটা হারিয়ে ফেলে। ওরা নিজের ভুল করা নিয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে এবং আমরা কিন্তু এভাবেই আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলো চালাচ্ছি। আমরা ভুলকে কলঙ্কিত করি। আমরা এখন এমন জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা চালাচ্ছি যেখানে ভুল করাকে একেবারেই নিকৃষ্ট হিসেবে ধরা হয়। আর তার ফল হল, আমরা মানুষকে শিক্ষিত করে তাকে তার নিজের সৃজনশীলতার বাইরে এনে ফেলছি। পিকাসো বলে গেছেন -- "সব শিশুই জন্মগতভাবে শিল্পী।" সমস্যাটা হল, বড় হওয়ার সাথে সাথে সেই শিল্পীসত্তাকে ধরে রাখা। আমি গভীরভাবে বিশ্বাস করি যে, আমরা সৃজনশীলতার ভিতরে বেড়ে উঠি না, ক্রমান্বয়ে আমরা এর বাইরে যেতে থাকি। ভালভাবে বললে, শিক্ষিত হয়ে আমরা এর বাইরে যেতে থাকি। কেন এমন হয়?

পাঁচ বছর আগ পর্যন্তও আমি স্টার্টফোর্ড-অন-এভানে থাকতাম। এমনকি, আমরা স্টার্টফোর্ড থেকেই লস এঞ্জেলসে এসেছি। আপনারা বুঝতেই পারছেন কতটা নিখুঁত ছিল অবস্থান্তরটা ! আসলে, আমরা থাকতাম স্নিটারফিল্ডে, স্টার্টফোর্ডের একটু বাইরে, যেখানে শেক্সপিয়ারের বাবার জন্ম। নতুন কোন ভাবনায় আটকে গেলেন? আমি কিন্তু আটকেছিলাম। শেক্সপিয়ারেরও যে বাবা আছে, তা আপনি কখনো চিন্তা করেন না, করেন কি? কারণ আপনারা নিশ্চয়ই শেক্সপিয়ারকে শিশু হিসেবে চিন্তাই করেন না, তাই না? সাত বছরের শেক্সপিয়ার? আমি কখনোই ভাবিনি। বলতে চাচ্ছি যে, সেও কখনো সাত বছরের শিশু ছিল। সেও কোন শিক্ষকের ইংরেজি ক্লাসে যেত, তাই না? সেটা কতটা বিরক্তিকর হতে পারে? "আরো ভালভাবে চেষ্টা কর" শেক্সপিয়ারের বাবা তাকে বিছানায় পাঠিয়ে বললেন "এখুনি ঘুমোতে যাও।" "পেন্সিলটা রেখে দাও। আর এভাবে কথা বলা বন্ধ কর। এটা সবাইকে মাথা খাচ্ছে।"

কেউ আমেরিকায় আসে এবং যখন কেউ বিশ্বভ্রমণে বের হয়: বিশ্বের সব শিক্ষাব্যবস্থাই বিভিন্ন বিষয়ে একই ক্রম মেনে চলে। প্রত্যেকটায়। আপনি যেখানেই যান না কেন। আপনি ভাববেন হয়তো অন্যরকম হতে পারে, কিন্তু তা নয়। সবচেয়ে উপরে আছে গণিত আর ভাষা, তারপর মানবিক, আর সবচেয়ে নিচে শিল্পকলা। বিশ্বের সব জায়গায়। এবং অধিকাংশ ব্যাবস্থাতেই আবার শিল্পকলার মধ্যেও উঁচুনিচু আছে। চিত্রকলা আর সংগীতকে সাধারণত স্কুলগুলোতে উচ্চমর্যাদা দেওয়া হয় নাট্যকলা আর নৃত্যের তুলনায়। এই দুনিয়ায় একটা শিক্ষাব্যাবস্থাও এমন নেই যেখানে প্রতিদিন নাচ শেখানো হয় যেমন করে আমরা প্রতিদিন অংক করাই। কেন? কেন নেই? আমি মনে করি এটাই জরুরি। আমি মনে করি, অংক খুব গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু নৃত্যও তেমনি গুরুত্বপূর্ণ। বাচ্চারা সারাক্ষণ নাচবে, যদি তাদের অনুমতি দেওয়া হয়, আমরাও কিন্তু তেমনি। আমাদের সবারই দেহ আছে, তাই না? আমি কি কোথাও ভুল বললাম? সত্যি বলতে কি, শিশুরা যখন বড় হয়, আমরা তাদের কোমরের থেকে শেখাতে শুরু করি আর তারপর উপরে উঠতে উঠতে আমরা তাদের মাথার দিকে নজর দিই। তারপর হালকাভাবে একদিকে।

আপনাকে যদি বাইরের কেউ হিসাবে শিক্ষাক্ষেত্র ঘুরিয়ে এনে জিগ্যেস করা হত, "কিসের জন্য, এই জনশিক্ষা?" আমার মনে হয় আপনি বলতেন -- আপনি যদি ফলাফলের দিকে তাকান, মানে যারা সত্যিই এটার মাধ্যমে সফল; যারা যা যা করার দরকার, তার সব করে, যারা সকল সামাজিক খ্যাতি পায়, যারা বিজয়ী -- আমার মনে হয় আপনাদের বলতে হবে যে পুরো বিশ্ব জুড়ে জনশিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক গড়ে তোলা। তাই না? তারাই তো পরীক্ষায় প্রথম হওয়া ছাত্র। আমিও এরকমই একজন ছিলাম, তাই আরকি। আর আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পছন্দ করি, কিন্তু তাদেরকে মানুষের অর্জনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে উঁচুদরের হিসেবে দেখা উচিত নয়। এটা জীবনযাপনের একটা উপায় মাত্র, অন্যক একটা উপায়। কিন্তু এরা জানতে বেশ আগ্রহী, তাদের প্রতি ভালোবাসা থেকেই বলছি। আমার অভিজ্ঞতা বলে প্রফেসরদের মাঝে জানার আগ্রহ রয়েছে -- সবার না, কিন্তু অধিকাংশেরই -- তারা তাদের মাথার ভিতরে বসবাস করে। তারা উপরেই বসবাস

করে, এবং হালকাভাবে এক দিকে হেলে। তারা সত্যি সত্যিই বিমূর্ত, শরীরবিহীন। তারা তাদের শরীরের দিকে তাকায় আর একে তাদের মাথার বাহন হিসেবে বিবেচনা করে, তাই না? এটা তাদের মাথাকে মিটিংয়ে নিয়ে যাওয়ার একটা পরিবহণ। যদি "দেহ-বহির্ভূত সত্তা" অভিজ্ঞতার আসল প্রমাণ পেতে চান, তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের একটা আবাসিক সভায় যান এবং সেই পার্টির শেষ রাতে নাচানাচির অনুষ্ঠানে হঠাৎ করে উদয় হোন। সেখানে আপনি দেখতে পাবেন -- পূর্ণবয়স্ক নারী-পুরুষেরা যন্ত্রণা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, অপেক্ষা করছেন পার্টি শেষ হওয়ার, যাতে তাঁরা বাড়ি গিয়ে এটা সম্পর্কে একটা গবেষণামূলক রচনা লিখতে পারেন।

এখন, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার ধর্ম "প্রতিষ্ঠানিক যোগ্যতা"-র উপর ঠিক করা হয়েছে। এখানে একটা কারণ আছে। বিশ্বে এই পুরো ব্যবস্থাটা উদ্ভাবন করা হয়েছে ১৯ শতকে। সত্যিই তার আগে কোন জনশিক্ষা ব্যবস্থা ছিল না। এ সব এসেছিল শিল্প-বিপ্লবের প্রয়োজন মেটাতে। তাই শিক্ষার ক্রমধারা দুইটি পর্যায়ে বিভক্ত হল। প্রথমত, যেসব বিষয় কাজের ক্ষেত্রে উপকারী, সেগুলো উপরের দিকে আছে। তাই আপনি যখন ছোট ছিলেন তখন আপনার কিছু ভাল লাগার বিষয়কে খুব যত্নে এড়িয়ে চলতেন, সেগুলোকে মাটিতে ছুড়ে ফেলে দিয়েছেন, এই ভয়ে যে ওগুলো নিয়ে পড়লে আপনি কখনো কোন কাজকর্ম পাবেন না। ঠিক কিনা? সংগীত চর্চা কোর না, তুমি সংগীতশিল্পী হবে না; ছবি এঁকো না, তুমি শিল্পী হবে না। বিনীত পরামর্শ -- এখন, এটা গভীরভাবে ভুল। একটা বিপ্লব এখন পুরো বিশ্বকে গ্রাস করেছে। আর দ্বিতীয়ত হল প্রাতিষ্ঠানিক যোগ্যতা, যেটা আসলেই আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক যোগ্যতাকে দেখার ভঙ্গি বদলে ফেলছে, কারণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাদের মত করেই ব্যবস্থাটি তৈরি করেছে। আপনারা চিন্তা করলে দেখবেন, আসলে বিশ্বে জনশিক্ষার পুরো ব্যবস্থাটাই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের একটা দীর্ঘায়িত ব্যবস্থা। আর তার ফল হল, অনেক উচ্চমানের মেধাবী, উজ্জ্বল, সৃষ্টিশীল মানুষ নিজেদের তা মনে করে না। কারণ তারা যে বিষয়ে ভাল ছিল, স্কুলে তার কোন মূল্য ছিল না, অথবা কলঙ্কজনক ছিল এবং আমার মনে হয় এভাবে আর চলতে দেওয়া যায় না।

ইউনেস্কো-র মতে, ইতিহাসের শুরু থেকে যত মানুষ স্নাতক হয়েছে , আগামী ৩০ বছরে এর সংখ্যা তার থেকেও বেশি হবে। আরো মানুষ, আর তা হল আমরা এতক্ষণ যেসব নিয়ে কথা বললাম তার সমষ্টি -- অর্থাৎ প্রযুক্তি আর কাজের রুপান্তরের উপর এর প্রভাব, এবং জনসংখ্যা তত্ত্ব আর বিশাল জনসংখ্যার বিস্ফোরণ। হঠাৎ করেই, ডিগ্রী এখন মূল্যহীন। সত্যি কিনা? আমি যখন ছাত্র ছিলাম, ডিগ্রী থাকা মানেই চাকরি নিশ্চিত ছিল। তবুও কারো চাকরি না থাকা মানে ছিল সে চাকরি করতেই চায় না। আর সত্যি কথা, আমিও চাইনি। কিন্তু এখন ডিগ্রী থাকলেও বাচ্চারা প্রায়ই বাড়িতে ছুটে আসে ভিডিও গেম খেলা চালিয়ে যাওয়ার জন্য, কারণ চাকরির জন্য এম.এ. দরকার, যেখানে আগের চাকরিতে বি.এ. করলেই চলতো, আর এখন অন্যগুলোর জন্য পিএইচডি দরকার। এটা প্রতিষ্ঠানিক স্ফীতির একটা প্রক্রিয়া। এটা ইঙ্গিত করে যে শিক্ষার পুরো গঠনটা আমাদের পায়ের তলাতেই বদলে যাচ্ছে। আমাদের বুদ্ধির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি মৌলিকভাবে পুনর্বিবেচনা করতে হবে।

বুদ্ধিবৃত্তি সম্পর্কে আমরা তিনটি জিনিস জানি। প্রথমত, এটা বহুমুখী। আমরা বিশ্বকে সেসব রূপে চিন্তা করি যা আমরা অভিজ্ঞতায় অনুভব করেছি। আমরা চিন্তা করি চাক্ষুষ, শব্দের মাধ্যমে, উপলব্ধির মাধ্যমে। আমরা চিন্তা করি বস্তুনিরপেক্ষ ভাবে, নড়াচড়ার মাধ্যমে। দ্বিতীয়ত, বুদ্ধিবৃত্তি প্রগতিশীল (গতিময়)। গতকাল বিভিন্ন উপস্থাপনায় আমরা যা দেখলাম, আপনারা যদি মানুষের মস্তিষ্কের কার্যকলাপের দিকে খেয়াল করেন তাহলে দেখতে পাবেন বুদ্ধিবৃত্তির পারস্পরিক ক্রিয়া বিস্ময়কর। মস্তিষ্ক বিভিন্ন কামরায় বিভক্ত নয়। এমনকি, সৃজনশীলতা -- যাকে আমি মূল্যবান মৌলিক চিন্তা করার প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচনা করি -- দৃষ্টিভঙ্গির সৃজনশীলতা আমাদের বিভিন্ন শৃঙ্খল দ্বারা নয়, বরং মনের মুক্ত কার্যকলাপ দ্বারা বিকশিত হয়।

মস্তিষ্ক উদ্দেশ্যমূলকভাবে -- বলে রাখি, মস্তিষ্কের দুই খণ্ডকে একত্র করে "করপাস ক্যালোসাম" নামের স্নায়ু-রশ্মি। মেয়েদের ক্ষেত্রে এটা তুলনামুলকভাবে মোটা। গতকাল হেলেনের কথা থেকে বলছি, আমার মনে হয় এই জন্যেই মেয়েরা একসাথে বহুকাজ ভালভাবে করে। এটা সত্যি, তাই না? এটা নিয়ে অনেক গবেষণা হলেও আমি আমার ব্যক্তিগত জীবন থেকে জেনেছি। আমার স্ত্রী হয়তো বাড়িতে রান্না করছে -- যেটা খুব কম হয়, ভাগ্য ভাল। কিন্তু ধরুণ, সে রান্না করছে -- না, সে কিছু জিনিসে খুব ভাল -- কিন্তু বুঝতেই পারছেন, সে হয়তো রান্না করছে, সে ফোনে মানুষজনের সাথে কথা বলছে, সে ছেলেমেয়েদের সাথে কথা বলছে, সে ছাদ রঙ করছে, সে ওখানে ওপেন-হার্ট সার্জারিও করছে। আমি যদি রান্না করতে যাই, দরজা বন্ধ থাকে, বাচ্চারা বাইরে থাকে, ফোন তার জায়গায় থাকে, আমার স্ত্রী আসলে আমার বিরক্ত লাগে। আমি বলি, "টেরি, প্লিজ, আমি এখানে ডিম ভাজতে চেষ্টা করছি। আমাকে বিরক্ত কর না।" আসলে, আপনারা সেই পুরানো দার্শনিক তত্ত্বটা জানেন, বনের মধ্যে কোন গাছ পড়লে কেউ যদি তা না শোনে, তবে কি তা হয়েছে? মনে পড়ে সেই পুরানো চেস্টনাট? আমি অতিসম্প্রতি একটা টি শার্ট দেখেছি, তাতে লেখা "একজন পুরুষ যদি বনের মধ্যে নিজের মনের কথা বলে, আর কোন নারী যদি তা শুনতে না পায়, তবুও কি সে ভুল?"

আর বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে তৃতীয়ত হল, এটা স্পষ্ট। এই মুহূর্তে আমি একটা নতুন বই লিখছি "এপিফেনী (Epiphany)", এটা বিভিন্ন মানুষের সাক্ষাৎকারের ধারার উপর ভিত্তি করে বানানো যে তারা কিভাবে নিজেদের প্রতিভা আবিস্কার করেছেন। এই পর্যায়ে যেভাবে তাঁরা এসেছেন, তা দেখে আমি মুগ্ধ। এটা সত্যি ঘটেছে যখন আমি একজন চমৎকার মহিলার সঙ্গে কথা

বলছিলাম, যাঁর কথা হয়তো অধিকাংশ মানুষই শোনেনি, তাঁর নাম জিলিয়ান লিন -- আপনারা তাঁর নাম শুনেছেন? কেউ কেউ হয়তো শুনেছেন। তিনি একজন নৃত্যপরিকল্পনাকারী (কোরিওগ্রাফার) এবং এমন একজন যিনি নিজের কাজ জানেন। তিনি "ক্যাটস্" এবং "ফ্যান্টম অব দ্য অপেরা" করেছেন। সব গুলিই অসাধারণ। আমি ইংল্যান্ডের রয়্যাল ব্যালের পরিচালনা পর্ষদে ছিলাম আপনারা বুঝতেই পারছেন।

সে যাক, জিলিয়ান আর আমি একদিন একসাথে লাঞ্চ করছি, আমি বললাম "জিলিয়ান, তুমি নৃত্যশিল্পী কিভাবে হলে?" সে বলল এটা খুব মজার; ও যখন স্কুলে ছিল, ও সত্যিই খুব হতাশ ছিল। স্কুলটা ত্রিশের দশকে ওর অভিভাবকের কাছে লিখেছিল, "আমাদের মনে হচ্ছে জিলিয়ানের কোন শিক্ষাজনিত অসুস্থতা আছে।" ও মনোযোগ দিতে পারত না; অস্থিরতায় ভুগতো। মনে হয়, একাল হলে তারা বলতো ওর ADHD (অতিমাত্রায় মনোযোগের অভাবজনিত রোগ) আছে। তাইনা? কিন্তু সেটা ছিল ১৯৩০ সালের দিকে, আর তখনো তো ADHD উদ্ভাবিত হয়নি। তখন সেটা খুব সুলভ অবস্থায় ছিল না। মানুষ জানতই না যে তাদের এটা হতে পারে।

সে যাক, ও এক বিশেষজ্ঞের কাছে গেল। সেখানে ওক-কাঠের দেয়ালের ঘরে ওর মা'র সাথে, ওকে শেষদিকের একটা চেয়ারে বসতে দেওয়া হল। ও সেখানে ২০ মিনিটের মত বসে রইল, ততক্ষণ সেই লোকটা ওর মায়ের সঙ্গে জিলিয়ানের স্কুল সম্পর্কিত সব সমস্যা নিয়ে কথা বলতে লাগলো। কারণ ও লোকজনদের বিরক্ত করত; ওর বাড়ির কাজ করতে সবসময় দেরি হত; আরও কত কী, আট বছরের ছোট শিশু -- শেষে, ডাক্তারটি এসে জিলিয়ানের পাশে বসে বলল, "জিলিয়ান, তোমার মা যা কিছু বলেছেন আমি তা শুনেছি। আর এখন তার সাথে আমার গোপনে কিছু কথা বলতে হবে।" সে বলল, "এখানেই অপেক্ষা কর। আমাদের ফিরতে দেরি হবে না। বেশি সময় নেব না" তারপর তারা তাকে রেখে চলে গেল। কিন্তু যাওয়ার আগে ডাক্তারটি তার রেডিও অন করে দিল, যেটা তার ডেস্কের উপরই রাখা ছিল। ঘর থেকে বের হয়েই ডাক্তারটি ওর মাকে বলল, "শুধু দাঁড়িয়ে ওকে দেখতে থাকুন।" আর ঠিক যেই মুহূর্তে তারা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, ও উঠে গিয়ে বাজনার সাথে সাথে নাচছিল। তারা কয়েক মিনিট ধরে এটা দেখলো, তারপর সে আমার মায়ের দিকে ঘুরে বলল, "মিসেস লিন, জিলিয়ান অসুস্থ নয়, ও একজন নৃত্যশিল্পী। ওকে নাচের স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিন।"

আমি জিগ্যেস করলাম, "তারপর কি হল?" ও বলল, "মা তাই করেছিল। আমি আপনাকে বোঝাতে পারব না সেটা কত চমৎকার ছিল। আমরা একটা ঘরে হাঁটছিলাম যেটা সম্পূর্ণ আমার মত মানুষ দিয়ে ভর্তি। যারা স্থিরভাবে বসে থাকতে পারত না। যাদের চিন্তা করতে হলেই নাচতে হত।" যাদের চিন্তা করতে হলেই নাচতে হত। ওরা ব্যালে করত, ট্যাপ করত, য্যাজ করত, ওরা আধুনিক নাচ করত, সমসাময়িক নাচ করত। এরপর, রয়্যাল ব্যালে স্কুলে নিয়োগের জন্য ও পরীক্ষা দিল এবং একক নৃত্যশিল্পী হয়ে গেল; রয়্যাল ব্যালেতে ও চমৎকার একটা কর্মজীবন পেল। অবশেষে ও রয়্যাল ব্যালে স্কুল থেকে স্নাতক হল এবং নিজের কোম্পানি গঠন করল -- দ্য জিলিয়ান লিন ড্যান্স কোম্পানি -- এন্ড্রু লয়েড ওয়েবার-এর সাথে ওর দেখা হল। ইতিহাসের কিছু অত্যন্ত সাফল্যময় সংগীতধর্মী নাটক সৃষ্টিতে জিলিয়ানের অবদান রয়েছে; ও লক্ষ লক্ষ মানুষকে আনন্দ দিয়েছে; আর ও একজন কোটিপতি; অন্য কেউ হলে হয়তো ওকে ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা করাতো আর বলতো শান্ত হয়ে থাকতে। এখন, আমি মনে করি...

আমার যা মনে হয়.. এটা যেখান থেকে এসেছে তা হলঃ আল গোর সেই রাতে পরিবেশ নিয়ে যা বলেছে এবং র্যা চেল কারসন "বৈপ্লবিক পরিবর্তন" কে যেভাবে তুলে ধরেছে। আমি বিশ্বাস করি যে ভবিষ্যতের জন্য আমাদের একমাত্র আশা হল মানুষের বাস্তুতন্ত্রের ক্ষেত্রে নতুন ধারণা গ্রহণ করা, যেখানে আমরা মানুষের ক্ষমতার ঐশ্বর্য সম্পর্কে আমাদের ধারণাকে নতুন করে গঠন করবো। শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের মনকে এমনভাবে দুর্বল করে তুলেছে যে আমরা খোলা খনি দিয়ে পৃথিবী ছেয়ে ফেলেছিঃ শুধুমাত্র একটা নির্দিষ্ট পণ্যের জন্য। ভবিষ্যতে, এটা আমাদের কাজে আসবে না। আমরা যেই মৌলিক নীতির উপরে ভিত্তি করে শিশুদের শিক্ষা দিচ্ছি তা নিয়ে আমাদের আবার চিন্তা করতে হবে। জোনাস সল্কের একটা চমৎকার বাণী হল, "যদি পৃথিবীর সব পোকামাকড় ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে তার ৫০ বছরের মধ্যে পৃথিবীতে বাকি সব জীবও ধ্বংস হয়ে যাবে। আর যদি পৃথিবীর সব মানুষ ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে তার ৫০ বছরের মধ্যে বাকি সকল প্রকারের জীব সমৃদ্ধি লাভ করবে।" আর সে ঠিকই বলেছে।

এখানে TED যা উদযাপন করছে তা হল, মানুষের কল্পনাশক্তির উপহার। আমাদের সচেতন হতে হবে যেন আমরা এই উপহারকে বিচক্ষণভাবে কাজে লাগাই আর যেসব ঘটনা সম্পর্কে এখানে জানলাম সেগুলোকে এড়াতে পারি। আর এটা করার একমাত্র উপায় হল নিজের সৃজনশীল ক্ষমতাকে এর প্রকৃত ঐশ্বর্য নিয়ে দেখা, আর সন্তানদের আমাদের আশা হিসেবে দেখা কারণ ওরা সত্যিই তাই। এবং আমাদের কাজ হল তাদের সম্পূর্ণ সত্ত্বাকে শিক্ষিত করা, যাতে তারা ভবিষ্যতের মুখোমুখি হতে পারে।

যাই হোক -- আমরা আমাদের সেই ভবিষ্যতকে দেখতে না পেলেও, ওরা পারবে। আমাদের কর্তব্য হল সেখান থেকে কিছু গঠন করতে ওদের সাহায্য করা। আপনাদের অনেক ধন্যবাদ।

বর্তমানে নঈ তালিমঃ কিছু সমস্যা এবং সম্ভাবনা

সুজিত সিনহা

অধ্যাপক সুজিত সিনহা বিগত তিন দশক ধরে পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন ক্ষেত্রে নিরলস ভাবে কাজ করেছেন এবং তিনি বর্তমানে আজিম প্রেমজি ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপক হিসেবে সংযুক্ত। তাঁর এই প্রবন্ধটি আজিম প্রেমজি ইউনিভার্সিটির Learning Curve নামক পত্রিকার মার্চ ২০১৫ সংখ্যায় প্রকাশিত Nai Talim Today : Some Issues and Possibilities নামক প্রবন্ধের অংশানুবাদ ।

গত ২০১৪ সালের আগস্ট মাসে আমি এবং আমার এক সহকর্মী মধ্যপ্রদেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের একটি জেলায় পরিদর্শনে গিয়েছিলাম, সেখানে বনাঞ্চলের অধিবাসী ... আদিবাসী বা আদিবাসী নয়, এমন যেসব মানুষদের নিজেদের বাসভূমি থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছিল, তাদের প্রত্যেককে এখন ২ হেক্টর করে জমি দেওয়া হয়েছে এবং তাদের জন্য নতুন গ্রাম তৈরি করা হয়েছে। সেখানে প্রতিটি গ্রামে সরকার স্কুলও খুলে দিয়েছে। এই রকম এলাকার একটি গ্রামে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত একটি চমৎকার স্কুল রয়েছে এবং সেটি একটি এন জি ও দ্বারা পরিচালিত হয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল সেই গ্রামে আগস্ট মাসেও বেশিরভাগ জমিতে কোনও চাষ করা হয়নি। প্রত্যেককে যে দুই হেক্টর করে জমি দেওয়া হয়েছিল, সেই জমিতে একটি বা দুটি করে সুদৃশ্য গাছ ছিল মাত্র। আমার সহকর্মী সেখানকার স্কুলের দশম শ্রেণীর পড়ুয়াদের সঙ্গে তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা বলেছিলেন, তাতে পড়ুয়ারা বলেছিল যে তারা এখানে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করবে, তারপর তারা কলেজে ভর্তি হবে। কিন্তু তারপর-- তারা এটাও বলেছে যে তারা খুব ভালভাবে জানে যে যারা বেস্ট তারাই চাকরি পাবে, আর এটা হবে দশজনের মধ্যে একজনের। এটাও অত্যন্ত লক্ষ্য করার বিষয় যে মধ্যপ্রদেশে একাদশ-দ্বাদশ পর্যায়ে পাঠ্যক্রমের মধ্যে কৃষি সংযুক্ত রয়েছে এবং এই স্কুলের সমস্ত পড়ুয়া কৃষি বিষয়টিকে তাদের পাঠ্যক্রমের মধ্যে বেছে নিয়েছে যেহেতু পাস করার ক্ষেত্রে এই কৃষি বিষয়টি খুব সহজ।

ভারত সরকারের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৪০ মিলিয়ন হেক্টর চাষের জমির মধ্যে মাত্র ৫৫ মিলিয়ন হেক্টর জমিতে একবারের বেশি চাষ হয়। এর অর্থ হল অবশিষ্ট ৮৫ মিলিয়ন হেক্টর জমিতে চাষ হয় মাত্র একবার। ঘটনাচক্রে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এটি ভারতের দরিদ্র হতাশাগ্রস্ত গ্রামীণ এলাকার চিত্র। বর্তমানে ভারতে প্রায় সমস্ত কৃষি পরিবেশ ও ভৌগোলিক এলাকায় যথেষ্ট মডেল রয়েছে, যেখানে উন্নত বিজ্ঞান সম্মত বাস্তুতান্ত্রিক পদ্ধতি দ্বারা ঐ ধরণের জমিতে ২\৩ গুণ মোট জৈব উৎপাদন বৃদ্ধি পেতে পারে। এখানে জৈব বলতে শুধুমাত্র মানুষের জন্য খাদ্য শস্য নয়, বরং জ্বালানী, তন্তু, বিভিন্ন প্রাণী, সার, মাছ, পশুখাদ্য, কাঠ এবং অন্যান্য অপ্রধান বনজ সম্পদকেও বোঝায়। আর এটা যেমন ভাবে বাণিজ্য কৃষিতে উৎপাদনের পরিমাপ করা হয়, তার থেকে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। এমনকি পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে যে ভৌগোলিক এলাকার উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানে একটি এন জি ও যে স্কুল চালায়, সেই স্কুলে এটা বিস্তারিত ভাবে দেখানো হয়েছে যে চাষের ক্ষেত্রে সঠিক ভাবে জলের ব্যবহার এবং সু-সংহত কৃষির মাধ্যমে মাত্র দুই হেক্টর জমি ব্যবহার করেও একটি পরিবারে কিভাবে সচ্ছলতা আসতে পারে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে ২০-২৫ বছর পিছনে কিউবার দিকে ফিরে দেখে নিতে পারি সত্যিই সেখানে কি ঘটেছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের অবসান হওয়ার পর ১৯৮৯ সালে কিউবারও পতন ঘটেছিল। প্রতি হেক্টরে সব চেয়ে বেশি রাসায়নিক সার ব্যবহার ও যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে কিউবা ছিল পৃথিবীর মধ্যে বাণিজ্য কৃষিতে সব চেয়ে উঁচু স্থানে কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের অবসান হওয়ার পর তা উধাও হয়ে গিয়েছিল। কিউবা তে ১৯৮৯ সালে যেখানে গড়ে ২৬০০ ক্যালোরি ভোগ করা সম্ভব ছিল, সেখানে ১৯৯৩ সালে তা নেমে এসেছিল প্রায় অনাহারের স্তরে ১৬০০ ক্যালোরিতে। কিন্তু ১৯৯৮ তে পুনরায় খাদ্য সামগ্রী ভোগের স্তর পৌঁছেছিল ২৬০০ ক্যালোরিতে। এখানে এটাই বলার উদ্দেশ্য যে কিউবা কৃষিক্ষেত্রে তার নতুন জ্ঞানকে খুঁজে নিতে পেরেছিল বলেই এটা সম্ভব হয়েছিল। শুধু নতুন জ্ঞান খুঁজে পেয়েই তারা ক্ষান্ত হয়নি, তারা সেই নতুন জ্ঞানকে বাস্তবে প্রয়োগও করেছিল। যেমন তারা ক্রমান্বয়ে কখনও পুরনো শস্য, কখনও নতুন শস্য চাষের(শস্য আবর্তন)উদ্যোগ নিয়েছিল, সাথী ফসলের চাষ ও মাটির জৈব পুষ্টির দিকে যেমন নজর দিয়েছিল, তেমনই জৈব সারের ব্যবহারকেও সুনিশ্চিত করেছিল। পাশাপাশি শস্য রক্ষায় তারা রাসায়নিকের ব্যবহারও বন্ধ করেছিল। চাষের ক্ষেত্রে তারা গ্রহণ করেছিল নতুন ধরণের কর্ষণ ও অজ্বালানী যান্ত্রিক পদ্ধতি। ১৯৯৭ সালে সেখানে মোট ২৩৪৪ টি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মোট ৬৪,২৭৯ জনকে জমি কর্ষণের জন্য কিভাবে ষাঁড়ের ব্যবহার করা যায় তা শেখানো হয়েছিল। তার ফলস্বরূপ দেখা যায়, ১৯৯০ সালে কিউবাতে ষাঁড়ের সংখ্যা ছিল ৫০,০০০, সেখানে ২০০০ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ষাঁড়ের সংখ্যা হয় ৪০০,০০০। শুধু তাই নয়, স্থানান্তর গমনের(migration) ছবিটাও পাল্টে যায়, তাতে দেখতে পাই যে কিউবাতে শহুরে শিক্ষিত তরুণ তরুণীরা শহর ছেড়ে গ্রামে

গিয়ে বসবাস শুরু করে।

সংক্ষেপে বলা যায়, শহর(শহরাঞ্চলের কৃষিও উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। হাভানা শহরে ফল ও বিভিন্ন সব্জি উৎপাদনের পরিমাণ বছরে চার মিলিয়ন টন।) ও গ্রামীণ এলাকা উভয় স্থানেই ভবিষ্যতে নঈ তালিম এর কাছে এটা একটা চ্যালেঞ্জ যে বিভিন্ন বয়সের উপযুক্ত ন্যচারাল রিসোর্স ম্যানেজমেন্টের কাজের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে মূল বিষয়গুলির (core subjects) লার্নিং ডিজাইন কেমন ভাবে করা হবে। কিন্তু যদি তা সঠিক ভাবে করা যায়, তাহলে পদার্থ বিজ্ঞান এবং জীববিজ্ঞান অপেক্ষা পরিবেশ বিজ্ঞান কম আকর্ষণীয় হবে না। এখানে উল্লেখ্য,নঈ তালিমে সমতা ও ন্যায় বিচার—এই দুটি বিষয়কে নির্দেশ করা হয়। এখন এটা একটা চ্যালেঞ্জ যে এই দুটি বিষয়কে বয়স অনুযায়ী সংবেদনশীল আচরণের মধ্য দিয়ে কেমন ভাবে তুলে আনা সম্ভব হবে — বিশেষত যখন ন্যাচারাল রিসোর্স ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে সম্পর্কিত ভাবে উৎপাদনমূলক কাজের বিষয় বা সমভাবে জমির পুনর্বণ্টনের বিষয় আলোচিত হবে এবং ব্যক্তিগত সম্পদ যখন কম্যুনিটির সম্পদে পরিগণিত হবে, যখন তা হবে সর্বসাধারণের। নঈ তালিমের মধ্যে এই বিষয়গুলিই রয়েছে সুসংহত ভাবে। আর এই বিষয়গুলি ছাড়া নঈ তালিম যে অর্থহীন, তা আর বলার অপেক্ষা রাখেনা।

ছাত্র ছাত্রী হিসেবে শতাধিক তরুণ তরুণী তাদের সময়ের একটা বড় অংশ কাটায় এই স্কুলগুলিতে। এই স্কুলগুলি তাদের জীবনের একটা সৃজনশীল অংশ। সুতরাং কম্যুনিটি এবং সমাজ এই বিপুল সম্পদ ভাণ্ডার থেকে কেন আরও কিছু পাবেনা।

নঈ তালিম, বিকেন্দ্রীকরণ এবং স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসনঃ

গান্ধীজী বলেছিলেন যে ছাত্র ছাত্রীদের দ্বারা উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করার মধ্য দিয়ে স্কুলগুলি হবে আর্থিকভাবে স্বনির্ভর। স্বাভাবিকভাবেই এই প্রক্রিয়ার দোষ ত্রুটিগুলির দিকে অনেকেই নির্দেশ করেছিলেন এবং এই প্রক্রিয়ার বিরোধীতা করেছিলেন। কিন্তু আজকের পরিপ্রেক্ষিতে গান্ধীজীর এই মতামতের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে বলতে পারি যে স্কুল শুধুমাত্র শিক্ষিত হওয়ার স্থান নয় এবং উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রস্তুত হওয়ার স্থান নয়, বরং পাঠক্রম অনুযায়ী স্থানীয় সমাজে তাদেরও কিছু দান থাকা উচিত।

গ্রামীণ এলাকায় স্কুলগুলি কখনও অষ্টম শ্রেণী, কখনও দশম শ্রেণী পর্যন্ত হয়, কখনও দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত হয় এবং স্কুলগুলির সেই রকম বড় কাঠামোও থাকে, সেই রকম প্রচুর শিক্ষকও থাকেন। এখানে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল ছাত্র ছাত্রী হিসেবে শতাধিক তরুণ তরুণী তাদের সময়ের একটা বড় অংশ কাটায় এই স্কুলগুলিতে। শুধু তাই নয়, এই স্কুলগুলি তাদের জীবনের একটা সৃজনশীল অংশ। সুতরাং কম্যুনিটি এবং সমাজ এই বিপুল সম্পদ ভাণ্ডার থেকে কেন আরও কিছু পাবেনা।

ধরা যাক, এমন একটি পরিস্থিতির তরঙ্গ সৃষ্টি হল যেখানে বিকেন্দ্রীকরণ, অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্র এবং তাৎপর্যপূর্ণ স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থা বিদ্যমান, তখন প্রয়োজন পড়বে স্থানীয় পরিকল্পনা যার জন্য আবার প্রয়োজন বেস লাইন সমীক্ষা, স্থানীয় সম্পদ সমীক্ষা, স্থানীয় পর্যায়ে নিয়মিত নজরদারি এবং মতামত প্রদানের ব্যবস্থা, প্রভাব সম্পর্কিত সমীক্ষা, তথ্য সমীক্ষা ও তাদের উপস্থাপনা ইত্যাদি। বিদ্যালয়ের ছাত্র এবং শিক্ষকরা সম্মিলিত ভাবে এই সব কাজ করতে পারেন তাঁদের বিদ্যালয় পাঠক্রমের অংশ হিসেবে। কেন এটি গুরুত্ব পূর্ণ তার দুটি কারণ রয়েছে। প্রথমত আজকের ভারতীয় পরিস্থিতিতে আমরা ভাবতে পারিনা যে একজন নির্বাচিত পঞ্চায়েত প্রতিনিধির এই সমস্ত গুণ গুলি বিদ্যমান থাকবে। দ্বিতীয়ত তারা সংখ্যাগত ভাবেও যথেষ্ট নন যে তাদের দ্বারা এই বিপুল কর্মকাণ্ড সম্ভব হবে, যার মধ্য দিয়ে তারা পরিকল্পনা গ্রহণ এবং রুপায়ণ করতে পারবেন। মাঝে মাঝে একটা কথা বলা হয় যে নিজস্ব এলাকায় গুণ মানের শিক্ষা সুনিশ্চিতকরণের জন্য পঞ্চায়েত কি করতে পারে। আমরা এই শূন্য স্থান পূরণ করতে পারি এই বলে যে গুণমানের স্থানীয় প্রশাসন এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের জন্য বিদ্যালয় কি করতে পারে। এই সম্পর্কের মিথস্ক্রিয়ার মধ্যেই লুকিয়ে আছে এই সময়ের প্রেক্ষিতে নঈ তালিমের অনন্ত তাৎপর্য।

এখানে একটি সম্ভাব্য তালিকা দেওয়া হল, যে গুলি নঈ তালিমের অন্তর্গত অংশ হতে পারে। একথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে এই ধরণের কাজগুলি ঠিক হবে একান্ত ভাবে স্থানীয় অবস্থার প্রেক্ষিতে।

১ প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং জীব বৈচিত্র্যঃ সুস্থায়ী কৃষি, উদ্ভিদ, প্রাণী পালন, মৎস্য চাষ, অরণ্য ভিত্তিক জীবিকা

২ কৃষি প্রক্রিয়াকরণঃ খাদ্য, তন্তু, হস্তশিল্প

৩ শক্তিঃ সৌর, অচিরাচরিত, বায়ু, বিদ্যুৎ ব্যবহারে দক্ষতা

৪ জল এবং শৌচঃ জল সংগ্রহ, সংহত করণ, জল পরীক্ষা, বিশুদ্ধ করণ

৫ বর্জ্যঃ বিভাগীকরণ এবং পুনরাবর্তন

৬ স্বাস্থ্য এবং পুষ্টিঃ স্বাস্থ্য বিধি, রন্ধন, অপুষ্টি, বনৌষধি নির্মাণঃ কাদা, মৃত্তিকা এবং বাঁশ

৭ বাই সাইকেল এবং পেডাল শক্তি

৮ স্থানীয় (সামাজিক অর্থনৈতিক) সমীক্ষা, সরকারী স্কিমগুলির সমীক্ষা

আজকের প্রেক্ষিতে নঈ তালিমকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে কিভাবে। খুব সাম্প্রতিক কালে বিভিন্ন রাজ্য উৎসাহ দেখিয়েছে নবম শ্রেণী থেকে বৃত্তি মূলক শিক্ষা শুরু করার জন্য। কিন্তু NCF 2005 বারবার বলেছে নঈ তালিম বৃত্তি মূলক শিক্ষা নয়। নঈ তালিম হল বৃত্তি মূলক শিক্ষাকে শিখনের উপায় হিসেবে ব্যবহার করার একটা উপায় এবং তার সমস্ত বিষয়ের পাঠদানে ব্যবহৃত হতে পারে প্রথম শ্রেণী থেকেই যা একই সাথে নিয়ে আসতে পারে মন, মস্তিষ্ক এবং হৃদয়ের সম্মিলন। বিহার হল একমাত্র রাজ্য যেখানে ৩৯০ টি নঈ তালিম বিদ্যালয় পুনরায় জাগরিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার ।

বিষয়ঃ প্রাথমিক শিক্ষায় অডিও-ভিসুয়ালের প্রয়োজনীয়তা

প্রথম শ্রেণীর "আমার বই" এর ২৩১ নং পৃষ্ঠায় 'পাখিরা' শিরোনামে একটি কবিতা রয়েছে। কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর এই কবিতাটি ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে খুবই আকর্ষণীয়। কবিতাটির নিচে পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক একটি শিখন পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। শিখন পরামর্শে বলা হয়েছেঃ "কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর পাখিরা কবিতাটি শিক্ষার্থীদের আনন্দের ছড়া হিসেবে ব্যবহৃত হবে। পাখিদের বিভিন্ন স্বভাব সম্বন্ধেও তাদের মনে ধারণা গড়ে উঠবে।" এই কবিতাটি নিয়ে যদি একটা অডিও-ভিসুয়াল তৈরি করা যায়, তাহলে কবিতাটি আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে। তা ছাড়া পাখির বিভিন্ন স্বভাব সম্বন্ধেও তাদের মনে ধারণা গড়ে উঠবে কিন্তু পাখিদের বিভিন্ন স্বভাব ছাড়াও তাদের বিভিন্ন ডাকও রয়েছে। পাখিদের বিভিন্ন ডাক বা আওয়াজ অডিও-ভিসুয়াল ছাড়া বোঝানো একেবারেই অসম্ভব। তাছাড়া পাখিদের বিভিন্ন স্বভাবের সাথে সাথে যদি স্বভাব অনুযায়ী তাদের বিভিন্ন ডাক বা আওয়াজ অডিও-ভিসুয়ালের মাধ্যমে দেখানো ও শোনানো যায় তাহলে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে তা আরও প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে।

পাশাপাশি সংখ্যার ধারণা, রং-এর ধারণা, আকৃতি, প্রকৃতি, পরিবেশ সকল বিষয়ের তথ্য প্রদানের মাধ্যমে তাদের বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে। ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে বিমুর্ত বিষয়গুলি মুর্ত হয়ে উঠবে। সত্যি কথা বলতে কি, অডিও-ভিসুয়াল এর মাধ্যমে শিক্ষা দান করা হলে প্রাথমিক শিক্ষাস্তরের পাঠ্যসূচীকে কঠিন থেকে সহজতর করে তুলতে পারে এবং এর গুরুত্ব প্রাক-প্রাথমিক ও প্রথম শ্রেণী অর্থাৎ শিক্ষার প্রথম ধাপে অনস্বীকার্য।

অডিও-ভিসুয়াল মাধ্যমে পাঠ্য বিষয়গুলি শুধু সহজ সরল বা বোধগম্য করে তোলাই নয়, পাঠ্য বিষয়ের প্রতি ছাত্র-ছাত্রীদের আকর্ষণ বৃদ্ধি করাও সম্ভব। মৌখিক পাঠদান কিংবা T.L.M কিংবা ব্ল্যাকবোর্ডের ব্যবহার করলে সকল শিশু সমানভাবে মনোযোগী নাও হতে পারে কিন্তু অডিও-ভিসুয়াল পদ্ধতির সাহায্যে পাঠদান করলে সকল শিশুর দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি একটি নির্দিষ্ট দিকে চালিত করা যাবে। ফলে তারা সকলেই মনোযোগী হয়ে উঠবে। অডিও-ভিসুয়ালের প্রযুক্তি বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে এইভাবে অমনোযোগী পড়ুয়াদের যেমন মনোযোগী করে তোলা যাবে, তেমনই ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুলে আসার যে ভীতি তাও দূর হবে এবং তাদের স্কুলে আসার আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে।

আমরা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে জানি যে প্রতিটি শিশুই টি. ভি. তে বিভিন্ন কার্টুন প্রোগ্রাম দেখে এবং তা উপভোগ করে। সেখানে ভাষা বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। দেখা যায় যে ভিন্ন ভাষা হওয়া সত্ত্বেও শিশুরা কার্টুনের বিষয় ও অর্থ সহজেই বুঝতে পারছে এবং খুব সহজেই কার্টুনের বিষয়গুলি তাদের মনের মধ্যে গেঁথে যাচ্ছে। অডিও ভিসুয়ালের এই সুফল আমরা ক্লাসের পাঠ্য বিষয়গুলি বোঝানোর ক্ষেত্রেও কাজে লাগাতে পারি। অডিও ভিসুয়ালের মাধ্যমে পাঠদান করলে প্রতিটি শিশুর পক্ষেই পাঠদানের বিষয়বস্তু সহজতর হয়ে যাবে এবং খুব দ্রুত মনের মধ্যে গেঁথে নিতে পারবে। এর ফলে পাঠ্যবিষয়গুলি অনেকদিন ধরে মনে রাখতে পারবে অর্থাৎ পাঠ্যবিষয়গুলি তারা সহজে ভুলবে না।

আরও বিশেষভাবে বলতে পারি অডিও-ভিসুয়ালের মাধ্যমে পাঠদান করলে সকল এগিয়ে যাওয়া কিংবা পিছিয়ে পড়া শিশুদের একসাথে সমানভাবে পাঠদানের বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা দেওয়া যাবে। ফলে পিছিয়ে পড়া শিশুরাও নিজেদের পাঠের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠবে। তাছাড়া অডিও-র মাধ্যমে শুনে শুনে শিশুরা নিজেদের উচ্চারণ, বানান সঠিক করতে পারবে যা তাদেরকে ভবিষ্যতে সুন্দর করে গড়ে তুলবে। Lastly I think, It is the time to take steps to apply Audio Visual system in 'Primary Education' to make a better shining India.

ক্ষমা রায়
প্রধান শিক্ষিকা, নেতাজী প্রাথমিক বিদ্যালয়
শ্যামাপ্রসাদ কলোনী, পোঃ হ্যামিলন্টনগঞ্জ,
কালচিনি মণ্ডল, জেলা- আলিপুরদুয়ার

স্কুল শুধুমাত্র শিক্ষিত হওয়ার স্থান নয় এবং উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রস্তুত হওয়ার স্থান নয়, বরং পাঠক্রম অনুযায়ী স্থানীয় সমাজে তাদেরও কিছু দান থাকা উচিত।

সুজিত সিনহা

আমার গ্রাম ও আমার গ্রামের ইতিহাস

কোচবিহার জেলার অন্তর্গত আমার গ্রামের নাম বালাডাঙ্গা। গ্রামে হিন্দু ও মুসলিম দুই জাতির মানুষ বসবাস করে। গ্রামের ডাকঘর বোড়োডাঙ্গা এবং ভূমি সমতল। গ্রামের উত্তরে ব্রহ্মানীর চৌকি, দক্ষিণ ও পূর্বে বোড়োডাঙ্গা এবং পশ্চিমে ভুতকুড়া অবস্থিত।

আমার গ্রাম পাশের অন্যান্য গ্রামের মতোই একটি উন্নয়নশীল গ্রাম। গ্রামবাসীদের প্রধান জীবিকা কৃষিকাজ। এখানকার প্রধান কৃষিজ ফসল হল ধান। পাট এখানকার একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী ফসল। এখানে যেমন নানারকম শীতকালীন সবজি পাওয়া যায়, তেমনি বসন্তকালীন ফুল ও ফল চাষ করা হয়। ধান এবং পাট ছাড়াও এখানে আরো নানারকমের ফসল চাষ করা হয়, যেমন – গম, আলু, তামাক, আখ, জোয়ার, ভুট্টা, ডাল, লঙ্কা ইত্যাদি। তবুও শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে অন্যান্য গ্রামের থেকে আমার গ্রাম কিছুটা পিছিয়ে রয়েছে। সম্বল বলতে শুধু চারটি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং দুটি অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার। কিন্তু উচ্চশিক্ষার জন্য প্রত্যেককে গ্রামের বাইরে যেতে হয়। আমার গ্রামের যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নতি হয়েছে, দুইটি পাকা রাস্তাও নির্মিত হয়েছে। রাস্তার দু-পাশে হয়েছে টিউবওয়েল। সমগ্র গ্রামেই বিদ্যুৎ প্রবেশ করেছে। কিছু কিছু জায়গায় রাস্তার মোড়ে আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।গ্রামের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে সরু ও দীর্ঘ একটি নদী। নদীর মাছ সংগ্রহ করে অনেকে জীবিকা চালায়। বর্ষাকালে নদীর দু-কূল প্লাবিত হয়ে বন্যারও সৃষ্টি হয়।

পাশের অন্যান্য গ্রামের চেয়ে আমার এই গ্রাম অনেক বেশি ইতিহাস প্রসিদ্ধ এবং ঐতিহ্যবাহী। ভুতকুড়া সংলগ্ন এলাকায় গ্রামে ছিল ঘন বন। বন থেকে মধু, মোম, কাঠ, ফল, ফুল, সংগ্রহ করে গ্রামের অনেকে জীবিকা নির্বাহ করত। বনে বাঘ, শৃগাল, নেকড়ে, খরগোশ এবং নানারকমের পাখি ও সাপ দেখা যেত। কি দিন কি রাত্রি গোয়াল থেকে নেকড়ে বাঘে গরু, ছাগল, ভেড়া টেনে নিয়ে যেত। সন্ধ্যা নামতেই গহন অরণ্যে শোনা যেত নানা রকমের চিৎকার চেঁচামেচি। গ্রামে তখন বিদ্যুৎ ছিল না, গোটা গ্রাম অন্ধকারে ভরে উঠত। নদীর এপার ওপার যাতায়াতের জন্য সম্বল ছিল গাছের তৈরি ভেলা। সড়কপথেও যাতায়াতের জন্য কোনো উন্নত ব্যবস্থা ছিল না। যাতায়াতের প্রধান মাধ্যম ছিল গরুর গাড়ি ও মহিষের গাড়ি। এই হল আমার গ্রাম বালাডাঙ্গার ইতিহাস।

কিন্তু এখন যেভাবে আমার গ্রাম বালাডাঙ্গায় শিক্ষা, বিদ্যুৎ, সংস্কৃতি, কৃষি ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হচ্ছে, তাহলে অদূর ভবিষ্যতে আমার গ্রাম উন্নয়নশীল থেকে অত্যন্ত উন্নত গ্রামে পরিণত হবে।

নাম – মুন্না হাবিব
বিদ্যালয় – ব্রহ্মানীর চৌকি (H.S)
শ্রেণী - নবম
রোল - ৩

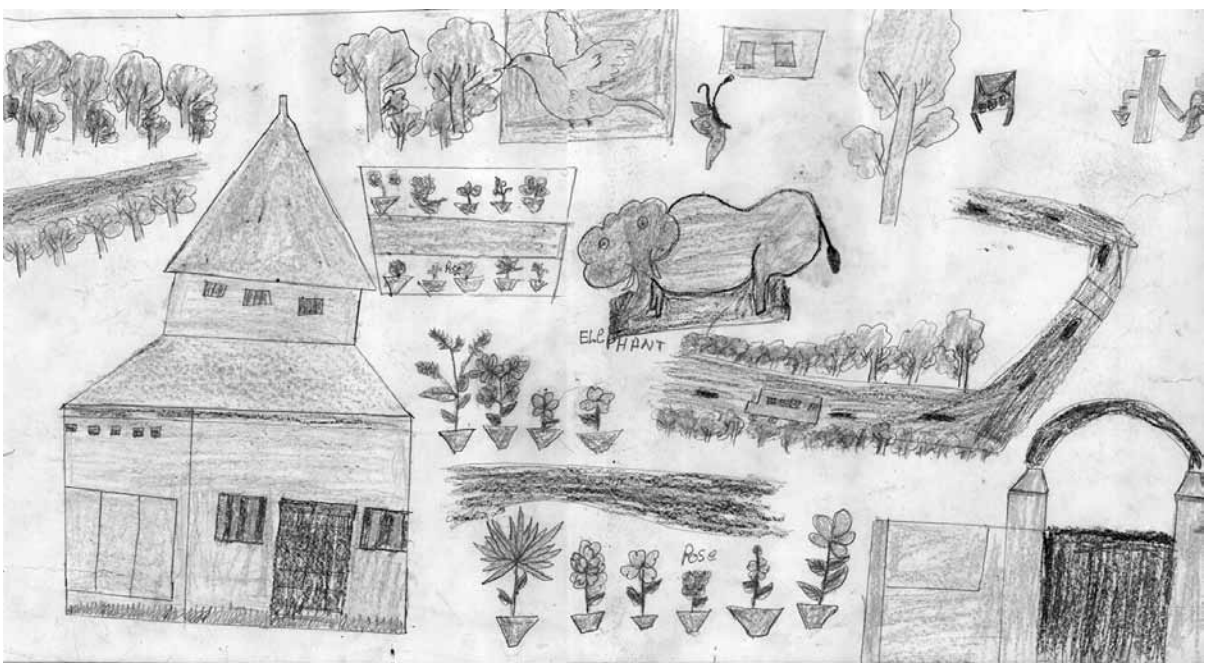

সেই সময়

প্রায় দেড়শ বছর আগে A STATISTICAL ACCOUNT OF BENGAL গ্রন্থটি লিখেছিলেন ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার। গ্রন্থটির প্রকাশকাল ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দ। মোট ২০ টি খণ্ডে প্রকাশিত এই গ্রন্থটি তে তৎকালীন বাংলার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন স্থান ও জেলার ভৌগলিক বিবরণ সহ সেখানকার অধিবাসীদের জীবন জীবিকা ও তাদের আর্থ সামাজিক চিত্র নানা তথ্য ও পরিসংখ্যানসহ যেভাবে পরিস্ফুটিত হয়েছে, তাতে তৎকালীন বাংলার জেলা ভিত্তিক যে পরিচয় আমরা পাই – তা আজও প্রাসঙ্গিক ।আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আমরা যদি একবার সেই পুরনো দিনগুলির দিকে তাকাই, তাহলে বুঝতে পারব এখন আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে রয়েছি । এখন দেখা যাক কেমন ছিল সেই সময়।

জলপাইগুড়ি

সেই সময় অর্থাৎ ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দ। তিস্তা নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত জলপাইগুড়ি জেলার সদর শহর জলপাইগুড়ি থেকেই জেলার সমস্ত প্রশাসনিক কাজ কর্ম পরিচালিত হত। সরকারি প্রশাসনিক দপ্তর গুলি ছাড়াও জলপাইগুড়ি শহরে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর একটি ঘাঁটি ও ছিল। কিন্তু মুলত এদেশীয় পদাতিক বাহিনী কে রাখার বন্দোবস্ত করা হয়েছিল সেখানে। জলপাইগুড়ি শহরের বিবরণ অনুযায়ী জানা যায় যে তখন এই শহরের জনসংখ্যা ছিল দেশীয় পদাতিক বাহিনী সহ প্রায় পাঁচ হাজার। জলপাইগুড়ি শহরে দোকানের সংখ্যা ছিল ১০-১২ টি। দোকান গুলির মালিকানা ছিল মাড়োয়ারি, বিহারী এবং দেশের উত্তর পশ্চিমের রাজ্য গুলি থেকে আসা লোকজনের হাতে।

১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে ৪৩ জন এবং ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে ৫৪ জন। এর মধ্যে পশ্চিম দুয়ারসে ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুর সংখ্যা ৫ জন হলেও ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে কোন মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়নি।

আর সদর শহর বাদে তৎকালীন সমগ্র জলপাইগুড়ি জেলার যে বিবরণ পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় এ জেলার একমাত্র পাহাড় বা পার্বত্য এলাকা ছিল ভূটান সীমান্তে অবস্থিত পশ্চিম ডুয়ারস। যেটা বক্সা নামে পরিচিত। বা বক্সা ডুয়ারস। ১৮৬৫-৬৭ খ্রিস্টাব্দে এই পশ্চিম ডুয়ারসে একটি সার্ভে অনুযায়ী এখানকার জনসংখ্যা ছিল ৪৯,৬২০ জন। এই বক্সা ডুয়ারসে ভূটান সীমান্ত এলাকায় সব চেয়ে উঁচু চূড়া টির নাম ছিল ছোট সিঞ্চুলা। ৫৬৯৫ ফিট উচ্চতায় অবস্থিত এই চূড়া টি থেকে সমগ্র বক্সা দুয়ারস এলাকাটির অপরূপ সৌন্দর্য উপভোগ করা যেত। এই চূড়া থেকে দেখা যেত বক্সা ডুয়ারস এলাকার গভীর জঙ্গল, যার মধ্যে ছিল বেশীরভাগই শাল গাছ আর দেখা যেত বিছিন্ন ভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কিছু কিছু চাষ আবাদের ক্ষেত। এই বক্সা দুয়ারসেই ছিল সেনাবাহিনীর একটি ক্যান্টনমেন্ট, যেখানে মূলত দেশীয় পদাতিক বাহিনীর স্থায়ী ভাবে থাকার বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। এই ক্যান্টনমেন্টটির নাম ছিল বক্সা ক্যান্টনমেন্ট। ভুটানে যাওয়ার জন্য এই বক্সা -ই ছিল মূল প্রবেশপথ। এই বক্সা পার্বত্য এলাকায় অপেক্ষাকৃত নিচের ধাপে ছিল কিছু কমলালেবুর বাগান। জায়গাটির নাম ছিল সোঁতরাবাড়ি।

জলপাইগুড়ি জেলার মূল নদীগুলি ছিল – মহানন্দা, করতোয়া, তিস্তা, জলঢাকা, দুদুয়া, মুজনাই, তোরসা, কালজানি, রায়ডাক এবং সনকোশ। প্রায় সমস্ত নদীতেই মালপত্র বহন করা ও পারাপারের জন্য বর্ষা কালে নৌকার ব্যবহার দেখা যেত। বর্ষাকাল ছাড়া বছরের অন্যান্য সময় অধিকাংশ নদীতে জল তেমন থাকত না। ফলে নদীগুলিতে

হেঁটেই পারাপার করা যেত। কিন্তু বর্ষাকালে নৌকা চলাচলের জন্য নদীগুলিতে কিছু ফেরি ঘাট গড়ে উঠেছিল। বাস্তবে মৃত্যু র সংখ্যা কিছু বেশী হলেও সরকারী নথি অনুযায়ী নদীগুলিতে মৃত্যু র সংখ্যা ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে ৪৩ জন এবং ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে ৫৪ জন। এর মধ্যে পশ্চিম দুয়ারসে ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুর সংখ্যা ৫ জন হলেও ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে কোন মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়নি।

১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের তথ্য অনুযায়ী জানা যায় যে জলপাইগুড়ি জেলায় এরকম মৎস্যজীবীদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৪০০-৫০০ পরিবার।

কিন্তু জলপাইগুড়ি জেলায় কোনও লেক বা হ্রদের অস্তিত্ব ছিল না। তেমনি চাষ আবাদের সুবিধার জন্য কোনও ক্যানাল বা কৃত্রিম জলাধারেরও কোনও ব্যবস্থা ছিল না। একমাত্র মেচ উপজাতির মানুষরা -যারা এই জেলার উত্তরে বাস করত, তারা বিভিন্ন ছোট ছোট নদী বা ঝর্না থেকে সরু নালা কেটে জল নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করত, তাদের চাষ-আবাদের জন্য। নদীগুলির মাধ্যমে সামান্য ব্যবসা বাণিজ্য চলত। জলপাইগুড়ি জেলার পাটগ্রাম থানা এলাকার কিছু ব্যবসায়ীর কথা জানা যায় – যারা তিস্তা নদীর মাধ্যমে চাল, পাট, তামাক ইত্যাদি সিরাজ গঞ্জ এবং ঢাকার বাজারগুলিতে রপ্তানি করত। জলপাইগুড়ি জেলা থেকে শাল কাঠও রপ্তানি করা হত। মূলত দার্জিলিং এবং জলপাইগুড়ি জেলার পশ্চিম দুয়ারস ও বৈকুণ্ঠপুরের বিস্তৃত শাল জঙ্গল থেকে ব্যবসায়ীরা শাল কাঠ সংগ্রহ করত। সেই শাল কাঠ তারা তিস্তা নদীর মাধ্যমে জেলার বাইরে রপ্তানি করত। পরিবর্তে তারা আমদানি করত লবণ, বাড়িতে ব্যবহৃত জিনিসপত্র, কাপড়, চিনি এবং বিভিন্ন মশলা। কিন্তু এটা এখানে উল্লেখ করা দরকার যে নদীপথে ব্যবসা বাণিজ্যের উপর সামগ্রিক ভাবে জেলার মানুষরা খুব বেশী নির্ভরশীল ছিল না।

সাপের কামড়ে শুধুমাত্র পশ্চিম ডুয়ারসেই ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে মারা গিয়েছিল ৬৫ জন, ১৮৬৮ তে ৭৬ জন এবং ১৮৬৯ এ মাত্র ৬২ জন।

সামগ্রিক ভাবে জলপাইগুড়ি জেলার অধিবাসীদের চাষ-আবাদ বা কৃষি-ই ছিল মূল জীবিকা। কিছু মানুষ মাছের ব্যবসার সঙ্গেও যুক্ত ছিল কিন্তু সে ব্যবসাও ছিল অনিয়মিত। অর্থাৎ মাছের ব্যবসাকে তারা মূল জীবিকা হিসেবে দেখেনি। ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের তথ্য অনুযায়ী জানা যায় যে জলপাইগুড়ি জেলায় এরকম মৎস্যজীবীদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৪০০-৫০০ পরিবার। তবে এই জেলায় কৃষিকাজ মূল জীবিকা হলেও তা খুব সহজসাধ্য ছিল না। কারণ মাটি ছিল কোথাও পাথুরে, কোথাও বা বালুময়। আর এই ধরণের মাটিতে চাষের জন্য জল ধরে রাখা যেত না। যেখানে কাদার ভাগ বেশী সেখানে ফসল ভাল হতো। জলপাইগুড়ি জেলায় এসময় যেসব ফসল নিয়মিতভাবে চাষ করা হতো – তার মধ্যে ছিল ধান, গম, বার্লি, সর্ষে, পাট, তামাক ইত্যাদি। তবে ধানই ছিল প্রধান ফসল। তুলোর চাষ ভাল হতো পশ্চিম ডুয়ারস অঞ্চলে।

সেনসাস রিপোর্ট অনুযায়ী জলপাইগুড়ি জেলায় পুরুষ ও মহিলার অনুপাত ছিল – ৫১.৬ (পুরুষ)ঃ ৪৮.৪ (মহিলা)। মোট জনসংখ্যা ছিল ৪১৮,০৪৮ জন।

জলপাইগুড়ি জেলায় অধিকাংশ কৃষিজীবী মানুষেরই নিজস্ব কৃষিজমি ছিল । তাদের নিজস্ব গবাদি পশুও ছিল। আর এই জেলায় ফসল ও সবজি যা উৎপাদন হত, তাতে জেলার মানুষদের চাহিদা মিটে যেত। অন্তত এইসব খাদ্যফসল জেলার বাইরে থেকে আমদানি করতে হতো না। এসময় কৃষি কাজের জন্য দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে মজুরও পাওয়া যেত। একজন মজুরের দৈনিক মজুরি ছিল তিন থেকে চার আনা। এই দিন মজুররা আসত জেলার বাইরে থেকে।

জলপাইগুড়ি জেলা ছিল ঘন অরণ্যে পরিপূর্ণ। পশ্চিম ডুয়ারসে বক্সা এলাকায় অরণ্য ছিল ছবির মত সৌন্দর্যময়। তবে জলপাইগুড়ি জেলায় বিশেষ করে একদম উত্তরে বিশাল এলাকা জুড়ে ছিল ঘন শাল জঙ্গল। এই শাল জঙ্গল বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গল মহল নামে বিশেষ পরিচিত। এই জঙ্গলটি তৎকালীন বৈকুণ্ঠপুরের রাজাদের অধিকারে ছিল এবং তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে পরিগণিত হত। এছাড়া আর কোন জঙ্গল মহল ব্যক্তিগত অধিকারে ছিল না। সমস্ত জঙ্গলেই শাল, শিশু, ম্যাঙ্গলিয়া প্রভৃতি ধরণের গাছ পাওয়া যেত। তবে বক্সা এলাকায় কিছু পরিমাণে রবার গাছের সন্ধান পাওয়া যায়।

পশ্চিম ডুয়ারস এলাকা এবং বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গল মহলে পশুচারণ ভূমিরও তথ্য পাওয়া যায়। পশ্চিম ডুয়ারসে একমাত্র সাপ ছাড়া অন্যান্য বন্য জন্তু জানোয়ারের উপদ্রব কমানোর জন্য তৎকালীন প্রশাসন বিশেষ পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থাও করেছিল। তৎকালীন তথ্য অনুযায়ী জানা যায় যে চিতা বাঘ হত্যা করতে পারলে প্রতি চিতা বাঘ অনুযায়ী যে পরিমাণ পুরস্কার দেওয়া হতো, প্রতি বাঘ অনুযায়ী তার দ্বিগুণ পুরস্কার দেওয়া হতো। এই ভাবে পশ্চিম ডুয়ারস অঞ্চলে ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে প্রচুর পরিমাণে বন্য জন্তু জানোয়ার হত্যা করা হয়। আর বন্য জন্তু জানোয়ার হত্যা করার জন্য দেশীয় শিকারীদেরই নিয়োগ করা হতো। সত্যি কথা বলতে কি, পশ্চিম ডুয়ারসে ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে বন্য জন্তু জানোয়ার হত্যা করার জন্য পুরস্কার বাবদ সারা বছরে খরচ হয়েছিল মোট ১৭৩৮ টাকা ।পাশাপাশি এই তথ্যও জানা যায় যে মৃত বন্য পশুদের চামড়া নিয়ে সেসময় কোনও ব্যবসাও করা হয়নি। তৎকালীন পুলিশ রিপোর্ট অনুযায়ী বন্য জন্তু জানোয়ারের আক্রমণে ও সাপের কামড়ে শুধুমাত্র পশ্চিম ডুয়ারসেই ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে মারা গিয়েছিল ৬৫ জন, ১৮৬৮ তে ৭৬ জন এবং ১৮৬৯ এ মাত্র ৬২ জন।

সেই সময় জলপাইগুড়ি জেলায় অনেক জনপদ ছিল, যে গুলি প্রকৃতপক্ষে গ্রাম হিসেবেই পরিগণিত হতো। কিন্তু প্রতিটি জনপদের পৃথক কোনও নাম ছিল না। জনপদগুলির মধ্যে অনেক দূরত্ব থাকা সত্ত্বেও সমস্ত জনপদগুলি মিলে একটা নির্দিষ্ট

গ্রামের নাম দেওয়া হতো এবং গ্রামের সেই নামটি সরকারি নথি তে নথিভুক্ত করা হতো। গ্রাম গুলিতে ধর্ম হিসেবে হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ ছাড়াও নেপালি, ভুটিয়া, কোচ বা রাজবংশী এবং মেচ, ওঁরাও, পাহাড়িয়া, মুরমি, বেদিয়া, ডোম, চণ্ডাল, চামার,বাউরি প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ বসবাস করত। জনসংখ্যার দিক থেকে প্রথম স্থানে ছিল হিন্দু ধর্মের মানুষরা এবং দ্বিতীয় স্থানে ছিল মুসলমান ধর্মের মানুষরা। তৎকালীন সেনসাস রিপোর্ট অনুযায়ী জলপাইগুড়ি জেলায় পুরুষ ও মহিলার অনুপাত ছিল – ৫১.৬ (পুরুষ)ঃ ৪৮.৪ (মহিলা)। মোট জনসংখ্যা ছিল ৪১৮,০৪৮ জন। এখানে উল্লেখ্য যে এই সেনসাসে নেপালি, ভুটিয়া, কোচ বা রাজবংশী প্রভৃতি মানুষদের সম্ভবত হিন্দু ধর্মের মধ্যে ধরা হয়েছিল। এই সেনসাসে মুসলিমদের মধ্যে ওয়াহাবি বা ফারাজি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত কোনও মানুষের সন্ধান পাওয়া যায়নি। ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক দিক থেকে জলপাইগুড়ি জেলা যে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ ছিল তা হান্টারের তৎকালীন বিবরণ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়। বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব উপলক্ষ্যে বিভিন্ন স্থানে গ্রামীণ মেলা ও জনসমাগমের বিবরণ পাওয়া যায় তাঁর রচনায়। পশ্চিম দুয়ারসে শিব রাত্রি উপলক্ষে জল পেশ মন্দিরে প্রায় দু হাজার মানুষের সমাগম হতো। প্রতি বছর ফেব্রুয়ারি মাসে এই উৎসব হতো । জলপাইগুড়ি জেলায় আরও দুটি মেলা অনুষ্ঠিত হতো – এর মধ্যে একটি মেলা অনুষ্ঠিত হতো তিতালিয়া নামক স্থানে, অন্য মেলাটি অনুষ্ঠিত হতো ফালাকাটায়। মেলা দুটি যাঁদের উদ্যোগে শুরু হয়েছিল তাঁরা হলেন ড. ক্যাম্পবেল এবং কর্নেল হাগটন। মেলা দুটির উদ্দেশ্য ছিল পাহাড়ি এলাকার বাসিন্দাদের সঙ্গে সমতল ভূমির বাসিন্দাদের একটা মেলবন্ধন তৈরি করা। আর বক্সা দুয়ারে আলিপুর নামক স্থানে অনুষ্ঠিত হতো একটি বার্ষিক বাণিজ্য মেলা।

১৮৭০-৭১ খ্রিস্টাব্দে জলপাইগুড়ি জেলায় সরকারি স্কুল ও সরকারি সাহায্য প্রাপ্ত মোট ৬৪ টি স্কুলের তথ্য পাওয়া যায় যেখানে মোট ছাত্রের সংখ্যা ছিল ১৩৭২ জন।

১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে মোট ৫৯৮ টি কেস পুলিসের কাছে দায়ের করা হয়েছিল। এর মধ্যে ৯৯ টি কেস ছিল মিথ্যা। বাকি কেস গুলির মধ্য থেকে যে অপরাধী চিহ্নিত হয় তাতে অনুপাত হিসেবে দেখা যায় – প্রতি ২০৭৩ জন জনসংখ্যায় অপরাধী মাত্র একজন।

সাধারণ মানুষের ঘর বাড়ি ছিল বাঁশ ও কাঠের খুঁটি দিয়ে তৈরি। বাড়ির দেওয়ালগুলি ছিল বাঁশের বেত ও ঘাসের খড় দিয়ে ঘেরা এবং তার উপর মাটির প্রলেপ দেওয়া হতো। জেলার অপরাধ বিষয়ে যে তথ্য পাই, তাতে জানা যায় যে জলপাইগুড়ি জেলায় তখন একটিই কারাগার ছিল, যেটি ডিসট্রিক্ট জেল হিসেবে পরিচিত ছিল। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে মোট ৫৯৮ টি কেস পুলিসের কাছে দায়ের করা হয়েছিল। এর মধ্যে ৯৯ টি কেস ছিল মিথ্যা। বাকি কেস গুলির মধ্য থেকে যে অপরাধী চিহ্নিত হয় তাতে অনুপাত হিসেবে দেখা যায় – প্রতি ২০৭৩ জন জনসংখ্যায় অপরাধী মাত্র একজন। ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে দেখা যায় সারা বছরে কারাগারে বন্দী করা হয়েছিল মোট ৪১২ জন কে। এর মধ্যে মুক্তি পায় ৩৯৯ জন। বাকি ১৩ জনের মধ্যে স্থানান্তর করা হয়েছিল ২ জনকে, কারাগারে মৃত্যু হয়েছিল ৯ জনের এবং ২ জন পালিয়ে যায়।

শিক্ষার দিক থেকে একমাত্র বোড়া ডিভিশন ছাড়া সমগ্র জলপাইগুড়ি জেলা ছিল অত্যন্ত পিছিয়ে। স্থানীয় অধিবাসীরা ছিল মূলত কৃষিজীবী, তাই তাদের ছেলে মেয়েরা অল্প বয়স থেকেই কৃষিকাজে যুক্ত হয়ে পড়ত। তাছাড়া স্কুলের দূরত্বও ছিল তাদের শিক্ষার পক্ষে একটা বড় বাধা। ১৮৭০-৭১ খ্রিস্টাব্দে জলপাইগুড়ি জেলায় সরকারি স্কুল ও সরকারি সাহায্য প্রাপ্ত মোট ৬৪ টি স্কুলের তথ্য পাওয়া যায় যেখানে মোট ছাত্রের সংখ্যা ছিল ১৩৭২ জন। সেই সময় জলপাইগুড়ি জেলায় কোনও উচ্চ বিদ্যালয় ছিল না। জলপাইগুড়ি শহরে যে মিডল ক্লাস ইংলিশ স্কুল ছিল সেটিই পরে ডিসট্রিক্ট স্কুল হিসেবে উন্নীত হয়। জানা যায় ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে জেলায় পাঠশালা ছিল মোট ৩৭ টি।

চিকিৎসা ব্যবস্থার দিক থেকেও জলপাইগুড়ি জেলা ছিল অত্যন্ত পিছিয়ে। সমগ্র জেলায় ছিল মাত্র তিনটি চ্যারিটেবল ডিসপেনসারি। সাধারণ মানুষের কাছে হিন্দু ধর্ম অনুসারী ঐতিহ্যময় চিকিৎসক বা কবিরাজরাই ছিলেন একমাত্র ভরসা । সেই সঙ্গে ছিল ওঝাদের উপর সাধারণ মানুষের বিশ্বাস। মন্ত্র ও ঝাড়ফুঁকের সাহায্যে ওঝারা চিকিৎসা করতেন।

"নালন্দা বিক্রমশিলা তক্ষশীলার বিদ্যায়তন কবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার নিশ্চিত কালনির্ণয় এখনো হয় নি, কিন্তু ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, য়ুরোপীয় য়ুনিভার্সিটির পূর্বেই তাদের আবির্ভাব। তাদের উদ্ভব ভারতীয় চিত্তে আন্তরিক প্রেরণায়, স্বভাবের অনিবার্য আবেগে। তার পূর্ববর্তী কালে বিদ্যার সাধনা ও শিক্ষা বিচিত্র আকারে ও বিবিধ প্রনালীতে দেশে নানা স্থানে ব্যাপ্ত হয়েছিল, একথা সুনিশ্চিত। সমাজের সেই সর্বত্র পরিকীর্ণ সাধনাই পুঞ্জীভূত রূপে এক সময়ে স্থানে স্থানে দেখা দিল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ" প্রবন্ধ থেকে গৃহীত।

আমাদের গ্রাম

"মাঠ ভরা ধান আর জল ভরা দিঘী
চাঁদের কিরণ লেগে করে ঝিকিমিকি"

অনেকগুলি বাড়ি কোথাও সারিবদ্ধ, কোথাও এলোমেলো- এটাই আমাদের গ্রামের চেহারা।এভাবেই বিশেষ জায়গা জুড়ে আমাদের গ্রামগুলি গড়ে উঠেছে। আমাদের এই গ্রামের বাইরে আরও অনেক গ্রাম রয়েছে। এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে যেতে হলে কাঁচা সরু গলি রাস্তা দিয়ে যেতে হয়। বর্তমানে আবার সরকার গ্রামের একটু উন্নতি করেছে, মাঝে মাঝে পাকা রাস্তাও করে দিয়েছে। যদিও পাকা রাস্তা, তবুও গ্রাম তো আমাদের গ্রামই । সেই ধান ক্ষেত, পুকুর, বাঁশ ঝাড়, নদী নালা, মেঠো পথ। কবি বন্দে আলি মিঞা-র কবিতায় এই বাঁশ ঝাড়, ধান ক্ষেতের বর্ণনা আমরা পাই। তাঁর লেখা আমাদের গ্রাম কবিতার কথা মনে পড়ে যায়। কবি লিখেছেন-

'আমাদের ছোটো গ্রাম মায়ের সমান
আলো দিয়ে,বায়ু দিয়ে বাঁচাইছে প্রাণ'

মা যেমন একটি শিশুকে আদর দিয়ে খাইয়ে দাইয়ে ধীরে ধীরে ছোট থেকে বড় করে তোলে, তেমনি আমাদের ছোট ছোট গ্রামগুলিও আমাদের আলো এবং বাতাস দিয়ে আমাদের সজীব ও প্রাণবন্ত রাখে।

গ্রাম কৃষক বা কৃষিজীবিদের জন্য উৎকৃষ্ট স্থান। গ্রামে মানুষেরা উৎপন্ন ফসলের জন্য সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মাঠে কাজ করে থাকে। গ্রামের প্রায় প্রতিটি বাড়িতে গরু, ছাগল, পুকুরে মাছ পালনের জন্য সুব্যবস্থা আছে। এর সাথে প্রতিটি বাড়িতে হাঁস, মুরগিও পালন করা হয়। গ্রামে বড় কোনও কলকারখানা নেই বা গ্রামে কোন উচ্চমাত্রার শব্দযুক্ত যন্ত্রচালিত মেশিন চলে না বলেই গ্রামগুলিতে শব্দহীন শান্ত পরিবেশ গড়ে ওঠে। কিন্তু বিভিন্ন ধরণের পাখির কলতানে গ্রামগুলি যেভাবে মুখরিত হয়ে ওঠে তা গ্রামেরই সৌন্দর্য, তা গ্রামেরই প্রাণবন্ত রূপ।

পাশাপাশি বর্ষাকালে মাঠ, ঘাট জলে ভরে গেলেও সবুজ ধানক্ষেতের দৃশ্য আমাদের মনপ্রাণকে যেন স্বপ্নের দেশে পৌঁছে দেয়। মাঠ ভরা সবুজ ধানের ক্ষেত, খাল বিল ভরা মাছেদের লাফালাফি- সব মিলিয়েই এই আমাদের গ্রাম, এই আমাদের স্বপ্নের বসবাস। এই গ্রাম ছেড়ে আমাদের মন আর অন্য কোথাও যেতে চায় না।

ভোরবেলায় বিভিন্ন ধরণের পাখির ডাকে সূর্য মামা স্থির থাকতে না পেরে ধীরে ধীরে তার সিদুঁর মাখা রঙ চারদিকে ছড়িয়ে গোল আকারে মাথা উচুঁ করে পূর্বাকাশে একটু একটু করে উপরে উঠতে থাকে, পরে রঙ বদলে রুপালী রঙ ধারণ করে, দিন এসে যায়। পাখিরাও দলবেঁধে আকাশে ডানা মেলে এদিক ওদিক খাদ্যের সন্ধানে উড়ে চলে।সেইরকম গ্রামের মানুষরাও ফসল ফলানোর জন্য সারাদিন মাঠে ব্যস্ত থাকে। কেউ বা উৎপন্ন ফসল হাটে বাজারে নিয়ে যায়, আবার বিক্রি বাটা সেরে বাড়ি ফেরে। সারাদিন এই ব্যস্ততার মধ্য দিয়েই সন্ধ্যা হয়, রাত নেমে আসে।

কিন্তু জেগে থাকে শিক্ষার আলো। গ্রামে প্রাইমারী স্কুল তো আছেই। এখন আবার আমাদের সরকার প্রতিটি ঘরে ঘরে এই শিক্ষার আলো আরও ভালভাবে পৌঁছে দেওয়ার জন্য গ্রামে শিশু শিক্ষা কেন্দ্র এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ও চালু করেছেন। গ্রামের প্রতিটি মানুষের মধ্যে থেকে হিংসা, নিন্দা এবং মূর্খতার আবরণ সরিয়ে দিয়ে চারিদিকে সুন্দর জ্ঞানের আলোর পরিবেশ তৈরি করে দিতে চাইছেন তাঁরা। ফলে গ্রামের ছেলে মেয়েরাও আর উচ্চশিক্ষা থেকে বঞ্চিত নয়। তারা এখন ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার স্বপ্নও দেখে।

আরও আনন্দের বিষয় যে শিক্ষার পাশাপাশি এখন গ্রামের বিদ্যালয়গুলিতে প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগিয়ে তৈরি করা হচ্ছে সবজি বাগান, নার্সারি, যা বাচ্চারা নিজে হাতে তৈরি করছে। আমাদের ঐতিহ্যময় চাষ ব্যবস্থা যেন হারিয়ে না যায়, তার জন্যও তৈরি হচ্ছে বিভিন্ন উদ্যোগ। তাই আমরা বালাডাঙ্গা-২ শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের সকল শিক্ষিকারা গ্রাম পঞ্চায়েত, গ্রামবাসীদের ও সরকারের কাছে প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ে পাঠক্রমের মধ্য দিয়ে গ্রাম ও গ্রামের সম্পদকে বাঁচিয়ে রাখার শিক্ষা চালু করার জন্য সহযোগিতা চাইছি।

গ্রামে স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রও গড়ে উঠেছে। সেখানে প্রতিদিন আমাদের গ্রামের মায়েরা তাঁদের বাচ্চাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে পরামর্শ নিয়ে থাকেন। আগের দিনে প্রায়ই শোনা যেত যে গ্রামে এক বা একাধিক শিশু কলেরা, ডাইরিয়া, বেরিবেরি ইত্যাদি রোগে মারা যেত বা প্রাণ হারাত।এখন তা প্রায় হয় না বললেই চলে। কারণ এখন গ্রামের প্রতিটি ঘরে ঘরে মায়েরা কিছু না কিছু লেখাপড়া জানে, তাই আগের দিনের তুলনায় শিশুদের উন্নতমানের খাদ্য দেয়, চিকিৎসা করায়, ফলে ঐ সকল রোগে শিশুমৃত্যুর হার কমে গিয়েছে।

গ্রামের বাড়িতে যত কষ্টই হোক না কেন, তবুও সেই শীতল বাতাস,শুদ্ধ অকসিজেন মনটাকে একেবারে শান্ত করে দেয়। বসন্তকালে গাছের ডালের আড়ালে যখন কোকিলের মিষ্টি সুর বেজে উঠে তখন কত যে আনন্দ লাগে, তা একমাত্র গ্রামের মানুষই উপলব্ধি করতে পারে। খোলা আকাশ, শুদ্ধ বাতাস, মেঠো রাস্তায় চলা, সবুজে ঘেরা মাঠ ঘাট গ্রামের মানুষদের জীবন করে তোলে আনন্দময়।

রুপেশ্বরী বর্মণ (সরকার)
সহায়িকা,বালাডাঙ্গা-২ শিশুশিক্ষা কেন্দ্র
ভেটাগুড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েত, কোচবিহার
ফোন নং ৯৯৩৩৩২৬৭৭৭

পুস্তক পরিচিতি

গুণে ভরা গাছ গাছালি

শিশু সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত 'গুণে ভরা গাছগাছালি' গ্রন্থটি শুধু জরুরী তাই-ই নয়, বরঞ্চ অনেক জটিল এবং আপাত নীরস বিষয়ের সহজ ও অনায়াসসাধ্য উপস্থাপনার গুণে হয়ে উঠেছে সংগ্রহে রাখার মতো নির্মাণ। "গুণে ভরা গাছ গাছালি" গ্রন্থটির লেখক দিনেন ভট্টাচার্য নিজেই জানিয়েছেন যে, এই গ্রন্থে গল্পের যে আঙ্গিক নেওয়া হয়েছে তার কারণ পুরো বিষয়ের আপাত নীরস বিষয় গুলি যেন শিশু-শিক্ষার্থীর মননে আগ্রহ এবং উদ্দীপনামুখী করতে সমর্থ হয়। টোটন মামা নামক একটি চরিত্রের মুখ দিয়ে বর্ণিত হয়েছে গাছের গুণাগুণ এবং তাদের ব্যবহারিক দিকগুলো, যা মানব শরীরের সতেজতা বা সজীবতা বৃদ্ধি করার জন্য খুব প্রয়োজনীয়।

খুব সংক্ষিপ্ত একটি ভূমিকায় লেখক জানিয়েছেন যে ভেষজ উদ্ভিদ চর্চা, যা শুরু হয়েছিল বৈদিক যুগে এবং জীবক, চরক-সুশ্রুতের হাত ধরে ভেষজ উদ্ভিদ চর্চা যে গুরুত্ব পেয়েছিল, তা আজকের দিনে তথাকথিত আধুনিকতার অহংকারে অবহেলিত। সর্বোপরি প্রাচীন ঐতিহ্য বিষয়ে রয়েছে আমাদের অসচেতনতা। লেখক চেষ্টা করেছেন আমাদের এই অবহেলা ও অসচেতনতাকে দূর করে যাতে ভেষজ উদ্ভিদ চর্চার মত প্রাচীন ঐতিহ্যশালী মহান ঐশ্বর্যগুলি বিষয়ে আমাদের শিশু কিশোরদেরও সমৃদ্ধ করা যায়।

সেই উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থে তুলসী, নিম, নয়নতারা, বাসব, অর্জুন, শুশনি, গিমে, গাঁদাল, মেথি, ধনেপাতা, বেতো, থানকুনি, কুলেখাড়া, কালমেঘ, থোড়, / মোচা / কলা, ডুমুর, বেল, তেঁতুল, আদা, মূলো, হলুদ, গাজর, সিম, পটল, চালকুমড়ো, সজনে, ঝিঙে, বেগুন, পেঁপে, কাঁচা লংকা, উচ্ছে বা করলা, শশা, টম্যাটো, আম, আমলকী, পেঁয়াজ, রসুন, নারকেল ইত্যাদি গাছের বহুমাত্রিক গুণাগুণ দিনেন ভট্টাচার্য সহজ সরল ভাষায় পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনার মাধ্যমে যে ভাবে তুলে ধরেছেন, আমাদের শিশু কিশোরদের কাছে তথা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে তা হয়ে উঠেছে একটি অনিবার্য শিক্ষা –উপাদান।

পাখি আর পাখি

প্রথমেই বলা যায় যে যারা পাখি ভালোবাসেন, পাখি নিয়ে চর্চা করেন, তাঁদের কাছে দিনেন ভট্টাচার্য লিখিত 'পাখি আর পাখি' গ্রন্থটি যেমন জরুরী, তেমন ভাবেই নুতন প্রজন্মের শিক্ষার্থীরা, যারা ধীরে ধীরে প্রকৃতি–সংলগ্ন হয়ে উঠছে,তাদের পাখি-সংক্রান্ত জ্ঞান এবং সংবেদনশীলতামুখি করতে এই গ্রন্থটি বিশেষ প্রয়োজনীয়। সর্বমোট ষোলোটি অধ্যায়ে লেখক তুলে ধরেছেন পাখির চেনা-অচেনা জগত, সেখানে শিক্ষার্থী –পড়ুয়ার কাছে পাখি হয়ে উঠবে অন্যতম বন্ধু। এই বইটিতে অন্যরকম একটি অধ্যায় হল 'পাখিরালয়'। খুব সংক্ষিপ্ত পরিসরে এই অধ্যায়ে আমাদের দেশের ১০টি পাখিরালয়ের বিবরণ দেওয়া হয়েছে সহজ সাবলীল ভাষায়। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হল 'হারিয়ে যাওয়া পাখি।' এই অধ্যায়ে লেখক সেই সব পাখির বিবরণ দিয়েছেন যে সব পাখি জলবায়ু পরিবর্তন অথবা মানবসভ্যতার আধুনিক হয়ে ওঠার তাড়নায় পৃথিবী থেকে চিরকালের মত বিদায় নিয়েছে। যে শিশুরা আমাদের আগামী পৃথিবীর নাগরিক এবং যারা এই পৃথিবীকে আরও বাসযোগ্য করে তুলবে, তাদের কাছে এই গ্রন্থ বিশেষ মর্যাদা পাবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

নদী

শিশু সাহিত্য সংসদ থেকে প্রকাশিত অসামান্য একটি গ্রন্থ হল 'নদী।' দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত এই অসামান্য গ্রন্থটি লেখকের ভাষা ও তথ্য পরিবেশনার গুণে হয়ে উঠেছে অনবদ্য। 'নদীর সঙ্গে পরিচয়','নদী কেমন করে বয়ে যায়', 'নদী নিয়ে গল্প ও কিংবদন্তী', 'বড় মাঝারি ছোট নদী', ভারতের বড় নদনদী', 'নদী যখন মানুষের বন্ধু' এই কটি অধ্যায়ে লেখক তুলে ধরেছেন নদী-সংক্রান্ত সেইসব অনিবার্য জ্ঞান এবং তথ্য যা শিশু–কিশোর মননে নতুন ভাবনা এবং চেতনার জগত উন্মোচন করতে পারে।

নদী তীরেই প্রথম গড়ে উঠেছিল সভ্যতা। 'উদ্ভ্রান্ত সেই আদিম যুগে' পৃথিবীর জলবায়ু এবং আবহাওয়া ছিল অনেক

চঞ্চল, তখন নদীর জল এবং জলজ সম্পদের হাত ধরে মানুষ শুরু করেছিল তার লক্ষাধিক বছরের সভ্যতা। আর আজ এই আধুনিকতায় মানুষ নদীর গতিরুদ্ধ করেছে কখনো কল্যাণে, কখনো শুধু লোভে। কিন্তু আজ যারা শিশু, যারা বিদ্যালয়ের পাঠক্রমে শিখছে নদী ভালোবাসার কথা, তারা যখন এই বই পড়বে, তা তাদের মননে তৈরি করবে এক নতুন স্পন্দন, যেখানে তারা নদীর প্রতি ভালোবাসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠবে । লেখকও সেটাই কামনা করেন।

ইস্কুলের গল্প

শিশু সাহিত্য সংসদ কর্তৃক প্রকাশিত 'ইস্কুলের গল্প' নামক ছোট গল্প সংকলনটিতে বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শঙ্খ ঘোষ পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত বাংলা সাহিত্যের ভুবন থেকে শ্রেষ্ঠ গল্পগুলিকে তুলে আনা হয়েছে, যেখানে 'ইস্কুল' রয়েছে পুরো গল্পের কেন্দ্রে। এরমধ্য দিয়ে আমরা যেমন গত দেড়শো বছরের ইস্কুল-যাপনের সাংস্কৃতিক বিন্যাসটি বুঝতে পারি তেমন বুঝে নিতে পারি ছাত্র সমাজ এবং শিক্ষক সমাজের সামাজিক -সাংস্কৃতিক পরিবর্তন গুলি। এই পরিবর্তন সবসময় যেমন আমাদের ইস্কুলের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলে, তেমন ভাবেই কোনও কোনও সময় আমরা বিরক্তও বোধ করি শিক্ষকের আচরণে। যেমন নীহাররঞ্জন গুপ্ত লিখিত ' প্রণাম জানাই' গল্পের নায়ক ছাত্র ধূর্জটি স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিয়ে জেলে যায়, তারই শিক্ষকের দেওয়া তথ্যে। এখানে শিক্ষক-ই ছদ্মবেশী পুলিশের চর। অন্যদিকে আমরা দেখেছি বৃহত্তর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্পর্শও এসে লেগেছিল সেদিনের শিক্ষাঙ্গনে। কবি অজয় ভট্টাচার্য লিখিত 'কোট' নামক অসামান্য গল্পে আমরা দেখি ধনী সন্তান অমল তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে পরিবারে সন্মানিত করতে নিজেই গজদন্ত মিনার থেকে নেমে এসে তার সঙ্গে এক হতে চাইছে।

এই সংকলনের সমস্ত গল্পে ইস্কুল হয়ে উঠেছে একটি অনিবার্য চরিত্র, যাকে ঘিরে প্রবাহিত হয় মননের দুনিয়া, সক্রিয়তার জগত। অশোক সেন এবং শুভেন্দু দাসমুন্সী মহাশয় লিখিত অসামান্য ভূমিকায় তুলে ধরা হয়েছে ইস্কুলের অন্তর -বাহির, যেখানে প্রবাহিত হয় অনন্ত জীবন এবং সংস্কৃতি।

ছোট্ট একটা স্কুল

স্কুল সংক্রান্ত গল্পে এবং গল্পের নির্মাণে বাংলা সাহিত্যের অনেক ঔপন্যাসিক ও ছোট গল্পকার তাঁদের মুন্সীয়ানা দেখিয়েছেন এবং তাঁদের লেখা গল্পগুলি এখনও বাংলা সাহিত্যের সম্পদ।

এরকমই একটি অসামান্য সম্পদ হল শঙ্খ ঘোষ রচিত গল্পগ্রন্থ "ছোট্ট একটা স্কুল।" শঙ্খ ঘোষ তাঁর ছোটবেলার স্কুল যাপনের টুকরো টুকরো ছবি তুলে ধরেছেন এই গ্রন্থে। লেখকের অসাধারণ মুন্সীয়ানায় গ্রন্থটির প্রতিটি গল্প হয়ে উঠেছে স্বাদু ও আকর্ষণীয়। লেখক নিজেই জানিয়েছেন যে স্বাধীনতার কয়েক বছর আগে থেকে যে স্কুলটিতে তিনি পড়েছেন, তারই কয়েকটি টুকরো টুকরো ছেলেমানুষি ছবি নিয়ে এই বই।

বইটিতে আছে মোট ১২টি ছোট ছোট গল্প। গল্পগুলি সবই কবির নিজস্ব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে নির্মিত হয়েছে। 'নিজের কাজ নিজে', 'রাত্রিবেলার ক্লাস', রবীন্দ্রনাথ কত পেতেন', 'না পাহারার পরীক্ষা', 'আপনখুশির পড়াশুনা', 'পরীক্ষার বন্ধুর পথ', 'নুতন মাষ্টারমশাই', 'সম্প্রদায়ের ভাষা', 'ইস্কুলের নট', 'রসগোল্লার উপযোগীতা', 'চন্দ্রবিন্দুর ব্যবহার', এবং 'একটু অপু একটু অমল' এই গল্পগুলিতে তিনি তুলে ধরেছেন অন্য এক সময় যাপনের ছবি। এ হলো সেই সময় যখন শিক্ষক ছিলেন জীবনের বস্তুতান্ত্রিক সাফল্যের বাইরের মানুষ, যিনি শেখান সার্থক হতে, তারপর সফল হতে। তিনি সবসময় ব্যবহার করেন আমরা' র মতো শব্দ।

প্রতিটি গল্পে তিনি তুলে ধরেছেন শিক্ষক এবং ছাত্রের সম্পর্কের সেই সব আলোকিত -ধুসর দিক গুলি, যা এখনকার সময়ের অর্থ ও বস্তুগত সম্পদ লোভী মানুষদেরও নতুন ভাবে উজ্জীবিত করতে পারে।

যদি আমরা জানি যে কি ধরণের সমাজ আমরা চাই, তাহলে আমরা বুঝতে পারব যে কি ধরণের শিক্ষা দিতে হবে।

জন ডিউয়ি

বিখ্যাত চিন্তাবিদদের ভাবনায় শিক্ষা

পাওলো ফ্রেইরী

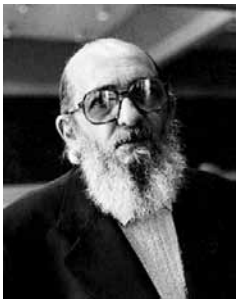

সেপ্টেম্বর ১৯, ১৯২১
মে ২, ১৯৯৭

নীরবতার বাতাবরণ ভেঙে গা ঝাড়া দিয়ে জেগে উঠেছে মানুষ। এমন মানুষ যারা তুচ্ছ, নগণ্য, অধিকারহীন, নিপীড়িত। শব্দকে হাতিয়ার করে উঠে দাঁড়াচ্ছে তারা। যে পরিস্থিতি, পরিবেশ তাদের গলাটিপে রেখেছে, সেটাকে বদলাবার চেষ্টা করছে তারা...

পাওলো ফ্রেইরীর জীবন নিয়ে একটা নাটক মঞ্চস্থ হলে, শেষ দৃশ্যটা এমনটা হলে তবেই মানাবে।

পাওলো ফ্রেইরী জন্মেছিলেন ১৯শে সেপ্টেম্বর ১৯২১ সালে। ব্রাজিলের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের রেসিফে (Recife) শহরে। সেই সময় ব্রাজিলসহ সারা লাতিন আমেরিকা জুড়ে চলছিল অর্থনৈতিক মন্দা। আর রেসিফে শহরটি কুখ্যাত ছিল তার দারিদ্র্য আর অভাবের জন্য। পাওলোর ছোটবেলা কাটে গরিবগুর্বো দূর্দশাগ্রস্ত মানুষদের সংস্পর্শে। আর্থিক অনটনের কারণে পাওলোর স্কুলজীবন বারবার ব্যাহত হয়। পরবর্তীকালে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়েছিল ট্রেড ইউনিয়নের আইনজীবি হিসাবে। শ্রমিকদের নানা বিষয়ে আইনি পরামর্শ দিতেন পাওলো ফ্রেইরী।

কর্মজীবন শুরু হয়েছিল ট্রেড ইউনিয়নের আইনজীবি হিসাবে। শ্রমিকদের নানা বিষয়ে আইনি পরামর্শ দিতেন পাওলো ফ্রেইরী।

সেই সূত্র ধরে ফ্রেইরী কারখানার শ্রমিক মজুরদের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। সেই সুবাদে তিনি নিরক্ষর খেটে খাওয়া মানুষগুলোর শিক্ষণের কাজে লেগে পড়েন। পাওলো নিজেও ছিলেন মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। আর্থিক দুরাবস্থা তাঁর পরিবারকে তাড়িয়ে ফিরেছিল। চারপাশের অনাহার আর দারিদ্র্যক্লিষ্ট মানুষদের দেখতে দেখতে তিনি এদের মধ্যে এক "নীরবতার সংস্কৃতি" লক্ষ্য করেছিলেন। আর্থিক অনুশাসন, সামাজিক ও রাজনৈতিক দমন পীড়নের চাপে মানুষগুলো মূঢ়, জড়বৎ জীবনযাপন করত। ক্ষমতাবানেরা শিক্ষাকে তাদের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে এবং এই অবদমন আর নীরবে মেনে নেওয়ার সংস্কৃতিকে জিইয়ে রাখে। পাওলো ফ্রেইরী ব্রাজিলের নিপীড়িত সমাজের সামনে তুলে ধরেন প্রশ্নমুখী শিক্ষা। পড়ুয়ারা সেখানে নীরব নিষ্ক্রিয় নয়। তারা তাদের চারপাশের জগৎ সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে শেখে, নিজের মনের ভাব প্রকাশ করতে করতে প্রশ্নের উত্তর খুঁজে নিতে শেখে। পড়ুয়ারা নিষ্ক্রিয় থেকে বস্তু বা অবজেক্ট থেকে সক্রিয় সাবজেক্ট বা বিষয়ী হয়ে উঠতে থাকে। পড়া-শেখা-জানার পরিমণ্ডলে ঘটে যায় এক উত্তরণ। আর ব্যক্তি উত্তরণের ছাপ গিয়ে পড়ে সমাজ-পরিবেশে। সেখানে ঘটতে থাকা অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের রুখে দাঁড়ানোর ক্ষমতা তৈরি হয়। পাওলো মনে করতেন যে মানুষ নিজেই নিজের সমস্যা থেকে বেরোনোর পথ খুঁজে নিতে পারবে। এই ভাবেই পাওলো ফ্রেইরী শিক্ষাকে সমাজ উত্তরণের হাতিয়ার হিসাবে দেখতে চেয়েছেন এবং সারাজীবন সেই উদ্দেশ্যেই কাজ করে গেছেন তিনি।

ক্ষমতাবানেরা শিক্ষাকে তাদের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে এবং এই অবদমন আর নীরবে মেনে নেওয়ার সংস্কৃতিকে জিইয়ে রাখে।

পাওলো ফ্রেইরীর বাল্যজীবনের দিকে যদি আমরা ফিরে তাকাই তাহলে আমরা দেখতে পাই যে সমুদ্রতীরের বালুতটে ছোট্ট পাওলো তার চেনা জানা শব্দ বলে চলেছে আর তার বাবা বালির উপর কাঠি দিয়ে সেই শব্দগুলো লিখে চলেছে। একেকটা শব্দ লিখছেন আর শব্দের মধ্যে লুকিয়ে থাকা ছোট ছোট শব্দ ধ্বনিতে ভাঙছেন। টুকরো টুকরো নানান শব্দ-ধ্বনি জুড়ে জুড়ে পাওলো আর তাঁর বাবা তৈরি করে চলেছেন আরো আরো নতুন নতুন শব্দ। পরে বড় হয়ে নিরক্ষর মানুষের সঙ্গে সাক্ষরতার কাজ করতে গিয়ে পাওলো কি ওই পদ্ধতিই অনুসরণ করেছিলেন ? তার কারণ ফ্রেইরীর প্রবর্তিত বয়স্ক শিক্ষা এগিয়ে ছিল এই প্রক্রিয়ায়ঃ প্রথমে পড়ুয়ারা তাদের চেনা – জানা, পরিচিত জগৎ থেকে শব্দ বেছে নিয়ে শব্দের জোগান দেবে। শব্দগুলো হতে হবে পড়ুয়ার অত্যন্ত পরিচিত এবং নিত্য-ব্যবহৃত। যেমন ধরা যাক সেই শব্দগুলি হলঃ বস্তি, লোক, ভোট, রুটি ইত্যাদি।

এগুলোকে বলা হয় মৌল শব্দ। এক একটা শব্দের সঙ্গে দেওয়া হবে শব্দ মিলিয়ে এক একটা ছবি। এই ছবি ঘিরে শুরু হবে সংলাপ–আলোচনা। আর সেই আলোচনায় উঠে আসবে নানা প্রাসঙ্গিক ভাবনা ও প্রশ্ন। আলোচনায় প্রতিফলিত হবে পড়ুয়াদের দৈনন্দিন জীবনধারা। শব্দ পড়তে পারার সঙ্গে সঙ্গে পড়ুয়ারা তাদের বাস্তব জীবন নিয়ে পড়বে, কথা বলবে, মতামত দেবে। নিজেদের জীবনকে নিজেদের মত করে তারা বুঝতে পারবে। পাওলো ফ্রেইরীর এই প্রক্রিয়ায় সাধারণ মানুষ শুধু সাক্ষরতা অর্জন করবে তাই নয়, সেই সঙ্গে পড়ুয়াদের মধ্যে গড়ে উঠবে নতুন চিন্তা-ভাবনা, মতাদর্শ, বিচার-বিবেচনা ও মূল্যবোধ। স্বাভাবিকভাবেই মানুষ নিজেদের অক্ষমতার বেড়া-জাল ভেঙ্গে নিজেদের নিয়তির নিয়ন্তা হয়ে উঠবে নিজেরাই। এমনটাই ঘটেছিল ব্রাজিলে। ফ্রেইরীর সাক্ষরতা প্রকল্প অভিভূত রূপে

সফল হয়। অল্প সময়ের মধ্যে দেশের চারকোটি নিরক্ষর মানুষ যাতে সাক্ষর হয়ে ওঠে সেই উদ্দেশ্যে তদানীন্তন ব্রাজিল সরকার প্রচেষ্টা করেন। সেটা ছিল ১৯৬৩ সাল।

১৯৬৪ তে ব্রাজিলের মিলিটারি শক্তি সে দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারকে হটিয়ে দেয়। দেশ জুড়ে যে জনপ্রিয় শিক্ষা আন্দোলন শুরু হয়েছিল সেটা বন্ধ হয়ে যায়। মিলিটারি শাসনতন্ত্র পাওলো ফ্রেয়ারের শিক্ষা দর্শনকে "ধ্বংসাত্মক" সাব্যস্ত করে এবং পাউলোকে নির্বাসনে পাঠানো হয়।

আমরা দেখতে পাই যে সমুদ্রতীরের বালুতটে ছোট্ট পাওলো তার চেনা জানা শব্দ বলে চলেছে আর তার বাবা বালির উপর কাঠি দিয়ে সেই শব্দগুলো লিখে চলেছে।

পাউলো ফ্রেইরী চলে যান বলিভিয়া। সে দেশের শিক্ষামন্ত্রকে কাজ নেন তিনি। বলিভিয়াতেও ঘটে যায় রাজনৈতিক পালাবদল। বলিভিয়া ছেড়ে পাওলো চলে যান চিলি-তে। সেখানে তিনি কৃষকদের মধ্যে বয়স্ক শিক্ষার প্রসারে নিজেকে নিযুক্ত করেন।

পাউলো-র শিক্ষাদর্শ পড়ুয়াদের মধ্যে প্রশ্ন করতে শেখায়। কৃষিকাজে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার হওয়া সত্ত্বেও কৃষকদের মজুরি কাঠামোতে কোন উন্নতি ঘটে না। ফ্রেইরীর শিক্ষা প্রকল্প এই দ্বন্দ্বকে তুলে ধরে এবং তা নিয়ে নানা বিতর্ক ও আন্দোলনকে উৎসাহিত করে। গ্রামীণ কৃষি নির্ভর তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির প্রযুক্তিগত সহায়তার নামে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবদমনও প্রকট হয়ে উঠছিল। ঠিক সেই সময়ে ফ্রেইরীর মুক্তিকামী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসার ঘটতে শুরু করে। তিনি তাঁর শিক্ষার কথা বলতে দেশে দেশে ঘুরে বেড়ান – যান আমেরিকা আর আফ্রিকার দেশগুলোতেও। ফ্রেয়ারে নিজেই বলতেন যে তাঁর শিক্ষাচর্চা দলিত –নিপীড়িতদের প্রতি অনেক বেশি দায়বদ্ধ।

জেনেভায় ফ্রেইরী এবং আরো কয়েকজন নির্বাসিত ব্রাজিলিয় মানুষ একজোট হয়ে তৈরি করেন ইনস্টিটিউট ফর কালচার্যাতল অ্যাকশন। এই সংস্থার কাজ ছিল তৃতীয় বিশ্বের স্বাধীনকামী দেশগুলোকে মুক্তির লক্ষ্যে শিক্ষা পরিষেবা দেওয়া। এই পরিষেবার উদ্দেশ্য ছিল দেশগুলির শিক্ষা ব্যবস্থায় বিপ্লবী রাজনৈতিক চেতনা জাগিয়ে তোলা। এই চেতনার জাগরণকে পাওলো ফ্রেয়ারে বলতেন বিবেক-উন্মেষ বা কনসেন্টাইজেশন। পাওলো ফ্রেইরী বিশ্বাস করতেন যে শিক্ষার মাধ্যমে ন্যায়-অন্যায় বোধ তৈরি হলেই মানুষ সকল বাধা-বিপত্তি ও অধীনতা থেকে মুক্তির উপায় খুঁজে নেবে।

আমাদের দেশের শিক্ষা ভাবনায় পাওলো ফ্রেইরীর শিক্ষাদর্শের লক্ষণ দেখতে পাই যখন ২০০৫ সালের জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখায় "ঊর্বর ও প্রাণময় শিক্ষা নির্মাণের" কথা বলা হয়। আর এই নির্মাণের শিকড় যে পড়ুয়ার "ভৌত ও সাংস্কৃতিক মাটিতেই গাঁথা থাকে" – সে কথাও এই রূপরেখা বলে। আমরা আশায় বুক বাঁধি।

এসো তাঁদের গল্প শোনাই

বিদ্যাসাগর

সেপ্টেম্বর ২৬, ১৮২০
জুলাই ২৯, ১৮৯১

আমরা সবাই তাঁকে জানি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নামে। আমরা অনেকেই শুধু বিদ্যাসাগর-ও বলি – আর এই নামেই তিনি দেশের মানুষের কাছে স্মরণীয় হয়ে আছেন। কিন্তু আমরা তাঁকে বিদ্যাসাগর বলি কেন? আসলে নানা শাস্ত্র, নানা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল তাঁর, তাই আমাদের দেশের মানুষ তাঁকে বিদ্যাসাগর আখ্যা দিয়েছিল। কিন্তু এখানে জেনে রাখা দরকার যে তাঁর জ্ঞান, শিক্ষা, তাঁর মেধা আর পাণ্ডিত্য – এ সমস্ত কিছুর পাশাপাশি তিনি ছিলেন একজন মহান সমাজ – সংস্কারক। তাঁর মনও সাধারণ মানুষের প্রতি দয়ামায়ায় এতটাই পরিপূর্ণ ছিল যে আমরা আদর করে তাঁকে দয়ার সাগরও বলে থাকি। কিন্তু বিদ্যাসাগর নামটিই সবার মুখে মুখে ছড়িয়ে গেছে।

তবে এখন তোমাদের জেনে রাখা দরকার যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আসল নাম ছিল ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি জন্মেছিলেন ১৮২০ খ্রিস্টাব্দের ২৬ শে সেপ্টেম্বর তারিখে মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে। তাঁর বাবার নাম ছিল ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মা ভগবতী দেবী। বিদ্যাসাগর তাঁর চরিত্রের অধিকাংশ গুণ পেয়েছিলেন মা ভগবতী দেবীর কাছ থেকেই। ভগবতী দেবী ছিলেন একজন কুসংস্কারমুক্ত মহিলা, মায়ের এই প্রভাব রয়েছে বিদ্যাসাগরের জীবনেও। বিদ্যাসাগরও কোনরকম সংস্কারে বিশ্বাস করতেন না। আর মায়ের প্রতি বিদ্যাসাগরের টান যে কতখানি ছিল তা জানতে পারি একটা ঘটনা থেকেই। মায়ের ডাকে সাড়া দিয়ে বিদ্যাসাগর ভয়ংকর অশান্ত দামোদর নদ সাঁতরে পার হয়েছিলেন। শুধুমাত্র মাকে দেখা করার জন্য বিদ্যাসাগর এই ভাবে নিজের জীবনের ঝুঁকি পর্যন্ত নিয়েছিলেন।

মায়ের ডাকে সাড়া দিয়ে বিদ্যাসাগর ভয়ংকর অশান্ত দামোদর নদ সাঁতরে পার হয়েছিলেন। শুধুমাত্র মাকে দেখা করার জন্য বিদ্যাসাগর এই ভাবে নিজের জীবনের ঝুঁকি পর্যন্ত নিয়েছিলেন।

বাল্যকালে বিদ্যাসাগর স্বাস্থ্যবান না হলেও খুব ছটপটে ও চঞ্চল প্রকৃতির ছিলেন। আর মনের মধ্যে ছিল অফুরন্ত শক্তি। তাঁর সঙ্গে কপাটি খেলায় তাঁর সমবয়সী বন্ধুরা কেউ পেরে উঠত না। বন্ধুদের হারিয়ে দিতেন তিনি। সেই সঙ্গে বাল্যকালে বিদ্যাসাগর ছিলেন ভারী দুষ্টু। কিন্তু পড়াশোনার ক্ষেত্রে কখনও অবহেলা করেননি। খুব মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করতেন। খুব বুদ্ধিমান ছিলেন। একবার কোনকিছু পড়লে, বা কোন কিছু শুনলে বা দেখলে তা অনায়াসে মনে রাখতে পারতেন। ফলে যে কোন বিষয় খুব তাড়াতাড়ি শিখে ফেলতে পারতেন। যেমন একবার বাবা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিদ্যাসাগর হাটা পথে কলকাতা গিয়েছিলেন। তখনকার দিনে তো এত যানবাহনের সুব্যবস্থা ছিল না, তাই হাঁটা পথেই তাঁরা কলকাতা রওনা দিয়েছিলেন। হাঁটতে হাঁটতে যাওয়ার সময় পথের ধারে মাইল স্টোন দেখে দেখে ইংরাজি সংখ্যা শিখে ফেলেছিলেন বিদ্যাসাগর।

পড়াশোনায় বিদ্যাসাগর এত বেশী বুদ্ধিমান ছিলেন এবং পড়াশোনার প্রতি তাঁর এত বেশী আগ্রহ ছিল যে বাবা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে আরও উচ্চশিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন। বাবা ঠাকুরদাস তাঁকে কলকাতায় নিয়ে এসে ভর্তি করে দিয়েছিলেন সংস্কৃত কলেজে। সংস্কৃত কলেজে এসেও বিদ্যাসাগর এত ভাল রেজাল্ট করেছিলেন যে সবাই অবাক হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বিদ্যাসাগর মেধাবী ছাত্র হলে কি হবে, বাবা ঠাকুরদাসের তেমন কোন ভাল উপার্জন ছিল না। তাই কলকাতায় পড়াশোনার সময় বিদ্যাসাগর কখনও খেয়ে, কখনও না খেয়েই দিন কাটিয়েছেন। তবু পড়াশোনার ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর কখনও অমনোযোগী হন নি।

ছাত্রজীবনেই বিদ্যাসাগর বুঝেছিলেন যে শুধু সংস্কৃত জানলে হবে না, ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্যও জানতে হবে। তাই সংস্কৃত শিক্ষার পাশাপাশি ইংরাজি ভাষা নিয়েও পড়াশোনা চালিয়ে গেছেন তিনি। তিনি বুঝেছিলেন যে নিজেকে নতুন যুগের উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে হবে। এই সময় বিদ্যাসাগরের মাথায় আসে নতুন নতুন ভাবনা, সমাজকে নতুন ভাবে গড়ে তোলার কথা চিন্তা করেন বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগরের বয়স তখন মাত্র একুশ।

ছাত্র জীবন শেষ করে বিদ্যাসাগর প্রথম চাকরি শুরু করেন ফোরট উইলিয়াম কলেজে। কিছু দিন পরে ফোরট উইলিয়াম কলেজ ছেড়ে দেন এবং যুক্ত হন সংস্কৃত কলেজে।

ছাত্র জীবন শেষ করে বিদ্যাসাগর প্রথম চাকরি শুরু করেন ফোরট উইলিয়াম কলেজে। কিছু দিন পরে ফোরট উইলিয়াম কলেজ ছেড়ে দেন এবং যুক্ত হন সংস্কৃত কলেজে। বিদ্যাসাগরের চেষ্টাতেই সংস্কৃত কলেজে শিক্ষার একটা চমৎকার পরিবেশ তৈরি হয়।

বিদ্যাসাগর বিশ্বাস করতেন যে যা কিছু শেখানো হোক না কেন, সহজ করে শেখাতে হবে। সংস্কৃত ভাষাকেও সহজ করে

শেখানোর জন্য বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষায় সংস্কৃত ব্যাকরণ চালু করেছিলেন। বিদ্যাসাগর অনুভব করেছিলেন শিক্ষাকে সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া দরকার। আর সাধারণ মানুষের মধ্যে শিক্ষাকে ছড়িয়ে দিতে পারলেই তাদের উন্নতি সম্ভব। আর এই উদ্দেশ্যেই তিনি লিখেছিলেন বর্ণপরিচয়। সেটা ছিল ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দ। ছোট দের জন্য বিদ্যাসাগর আরও দুটি বই লিখেছিলেন, বই দুটির নাম হল – বোধোদয় এবং কথামালা। তখনকার দিনে তাঁর আরও দুটি বই খুব প্রশংসা পেয়েছিল – এর মধ্যে একটি বই হল শকুন্তলা, অন্য বইটি হল সীতার বনবাস।

বিদ্যাসাগর ছিলেন খুব দৃঢ়চেতা মানুষ। ফলে যা ভাবা তাই কাজ, ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাস থেকে ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের মে মাস - এই সাত মাসে বিদ্যাসাগর মেয়েদের জন্য ৩৫ টি স্কুল চালু করেছিলেন।

এখন আমাদের সবার জানা দরকার যে বিদ্যাসাগর কখনও অন্যায়কে মেনে নিতে পারতেন না। অন্যায়ের সঙ্গে কখনও আপোষ করতেন না। মানুষকে যেমন তিনি সম্মান ও মর্যাদা দিতেন, তেমনি নিজেও নিজের সম্মান ও মর্যাদা বিষয়ে খুব সচেতন ছিলেন। পাশাপাশি বিদ্যাসাগর ছিলেন উদার বা মুক্ত মনের মানুষ। কোনও রকম কুসংস্কারকে তিনি প্রশ্রয় দিতেন না। আমাদের দেশে সে সময় শুধুমাত্র ব্রাহ্মণরাই সংস্কৃত শিখতে পারত, ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য কারও সংস্কৃত শিক্ষার অধিকার ছিল না – বিদ্যাসাগরই প্রথম এই নিয়মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন। তাছাড়া মহিলাদের উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রেও বিদ্যাসাগর এসময় বিশেষভাবে উদ্যোগী হয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর বলেছিলেন যে শুধু ছেলেদের কথা ভাবলে চলবে না, মেয়েদের মধ্যেও শিক্ষা চালু করতে হবে। আর এজন্য বিদ্যাসাগরকে অনেক বাধা বিঘ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে, তখনকার সমাজের গোঁড়া মানুষেরা বিদ্যাসাগরের নামে নানা কুৎসাও রটিয়েছে। কিন্তু বিদ্যাসাগরকে তাতে দমানো যায় নি। বিদ্যাসাগর ছিলেন খুব দৃঢ়চেতা মানুষ। ফলে যা ভাবা তাই কাজ, ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাস থেকে ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের মে মাস - এই সাত মাসে বিদ্যাসাগর মেয়েদের জন্য ৩৫ টি স্কুল চালু করেছিলেন। এখানেই থেমে থাকেন নি তিনি, তাঁর চেষ্টাতেই চালু হয় বিধবা বিবাহ। বিধবা বিবাহ আইন পাশ হয় তাঁরই একান্ত প্রচেষ্টায়। এই আইন পাশ হবার পর সমাজে একঘরে করার হুমকিও তাঁকে শুনতে হয়েছে। কিন্তু বিদ্যাসাগর ছিলেন নির্ভীক মানুষ, তিনি সমাজে বহু বিবাহ বন্ধ করারও উদ্যোগ নিয়েছিলেন। শেষ বয়সে বিদ্যাসাগর কারমাটরে আদিবাসী মানুষদের জন্যও স্কুল খুলেছিলেন। আদিবাসী মানুষদের সঙ্গেও একাত্ম হয়ে উঠেছিলেন তিনি।

১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের ২৯ শে জুলাই তারিখে বিদ্যাসাগর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এখন বিদ্যাসাগর যে সমাজ গড়তে ছেয়েছিলেন এবং বিদ্যাসাগরের জীবনের যে আদর্শ ছিল - তাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব তোমার, আমার, সবার।

স্কুলেই কাজ শিখে রোজগার, উদ্যোগী শিক্ষকরাঃ উৎসাহ দেখাচ্ছে প্রশাসন

সম্প্রতি ৫ই সেপ্টেম্বর, ২০১৫ তারিখে "এই সময়" পত্রিকায় "স্কুলেই কাজ শিখে রোজগার, সালানপুরে উদ্যোগী শিক্ষকরা" শীর্ষক একটি সংবাদ আমাদের যথেষ্ট উৎসাহী করে তুলেছে। বিস্তারিত ভাবে বলা যায় যে বর্ধমান জেলার সালানপুর ব্লকের হিন্দুস্তান কেবলস নিম্ন বুনিয়াদী স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকারা নতুন করে বুনিয়াদী শিক্ষার বর্ণ পরিচয় রচনা করছেন। তীব্র অনাহার আর দারিদ্রেযর সামনে অন্যরকম পাঠ ভাবনা নিয়ে এই বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা শুরু করেছিলেন তাদের নিজস্ব অভিযাত্রা। শিশুদের জন্য তাঁরা শুরু করেছিলেন মোমবাতি বানানোর মত কিছু হাতে কলমে শিক্ষা, যে শিক্ষা নিয়ে গত বছর কালীপুজোর সময় ছাত্রছাত্রীরা পৌঁছে গিয়েছিল বিপনণের দরজায়। পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথি দেশপ্রাণ ব্লকের চণ্ডীভোট বাড় প্রাইমারী বিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও এই ধরণের অন্য যাত্রার শরিক হয়েছেন। সেখানে পড়ুয়ারা নিজের হাতেই তৈরি করছে পুষ্টি বাগান, বিদ্যালয়ের পাশের পুকুরে তারাই করছে মাছ চাষ। আর এসবগুলি যেমন তাদের মিড ডে মিলে ব্যবহার করা হচ্ছে, তেমনই তাদের আত্মনির্ভরতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আত্মবিশ্বাসও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

নব দিশা এই ধরণের আনুষঙ্গিক পাঠ ভাবনাকেই সামনে নিয়ে আসতে চেয়েছে বার বার। এই ধরণের জীবন সংলগ্ন শিক্ষার জন্যই রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী তাঁদের তাত্ত্বিক মত এবং পথ আজীবন শাণিত রেখেছিলেন। আমাদের ভাল লাগছে এই ভেবে যে আজ মূল ধারার সংবাদপত্রেও এই ধরণের নতুন ভাবনা উঠে আসছে সবার সামনে। শুধু তাই নয়, শিক্ষক দিবসে এই সব বিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও সম্মানিত হয়েছেন রাজ্য সরকারের কাছে।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রাচীন-ভারতের শিক্ষার ঐতিহ্য

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বরূপ' ভাষণের সময়কালে আমাদের সামনে প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ঐতিহ্যের বিভিন্ন চিহ্নগুলি তুলে ধরার সময় খুব অনুপুঙ্খ ভাবে সেদিনের নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস এবং ঐতিহ্যের বিভিন্ন শিখর মুহূর্তগুলি নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। প্রাচীন ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে নালন্দাই তার বৌদ্ধিক উচ্চতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক সাফল্যের জন্য পৃথিবী জুড়ে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে থেকেছে। মহাযান বৌদ্ধ দর্শনের বিকাশ এবং প্রতিষ্ঠার জন্য সৃষ্ট হলেও যত পরিণত হয়েছে এই বিশ্ববিদ্যালয়, ততই ধর্ম নয় – বরঞ্চ বিশুদ্ধ জ্ঞান এবং সংস্কৃতির চর্চাই হয়ে উঠেছে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম লক্ষ্য।

পাটলিপুত্রের চল্লিশ মাইল দক্ষিণে এবং প্রাচীন মগধের রাজধানী রাজগৃহের সাত মাইল উত্তরে বর্তমানে বিহার শরীফ জেলার বড়গাঁও-এর নিকটে নালন্দা অবস্থিত। তিব্বতের ঐতিহাসিক তারানাথের মতে মাধ্যমিক দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা নাগার্জুন খ্রীষ্টিয় চতুর্থ শতকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। চীনের পরিব্রাজক ফা-হিয়েন ৪১০ খ্রীষ্টাব্দে যখন ভারতে এসেছিলেন তখন এই শিক্ষাকেন্দ্র খ্যাতির শীর্ষে ছিল এমন নয়, কিন্তু হিউয়েন-সাঙ যখন ৬২৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এখানে পরিভ্রমণ এবং শিক্ষালাভ করেন তখন নালন্দার মেধাচর্চা সারা বিশ্বে সমাদৃত। হিউয়েন-সাঙ এর বিবরণে নালন্দার মেধাচর্চার জগত যেরকম প্রতিভাত হয়েছে, সেটাই আমাদের কাছে আজও পর্যন্ত সবচেয়ে প্রামাণ্য তথ্য বা নথি।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন ধরণের ছাত্ররা প্রবেশাধিকার পেত, তা নিয়ে প্রচুর গবেষণা হয়েছে এবং এখনও পর্যন্ত হয়ে চলেছে। আমরা বিভিন্ন নথি থেকে জানতে পারি যে সাধারণ মেধা সম্পন্ন ছাত্রদের এখানে প্রবেশ করা অসম্ভব ছিল, বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতদের কাছে ছাত্রদের নিজের বিদ্যা-বুদ্ধি পরীক্ষা দিয়ে তবে মূল ভবনে প্রবেশ করতে হতো। প্রতি দশজনে ২/৩ জনের বেশি এই প্রতিষ্ঠানে অন্তর্ভূক্ত হওয়ার সুযোগ পেত না।

যখন হিউয়েন-সাঙ এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলেন তখন অধ্যক্ষ পদ অলংকৃত করে ছিলেন মহাস্থবির শীলভদ্র, এই সময় দশ হাজার ছাত্র এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠরত ছিলেন। একেকজন আচার্য অথবা উপাধ্যায়ের কাছে পড়াশুনো করতেন ১০/১২ জন ছাত্র। এই সব ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব আবাসেই থাকতেন।

নালন্দার পাঠক্রম নিয়ে আজও দেশ-বিদেশে অনেক গবেষণা চলছে। বৌদ্ধধর্ম দর্শনের পাঠ গুরুত্বপূর্ণ হলেও হিন্দুধর্ম শাস্ত্র, নন্দনতত্ত্ব, দর্শন চিকিৎসাবিদ্যা, রসায়ন এমন কি জ্যোতিষ এবং নক্ষত্রচর্চাও করা হত। নালন্দার খ্যাতির সিংহভাগ জুড়ে আছে এর বিরাট গ্রন্থাগারত্রয়। তাদের নাম ছিলো রত্নসাগর, রত্নরঞ্জক এবং রত্নোদধি। প্রচুর ছাত্র এই গ্রন্থাগারের অমূল্য সম্পদ পুঁথিগুলি নকল করার কাজে ব্যাপৃত থাকতেন। যা তার দক্ষিণ – পূর্ব এশিয়ায় নিজেদের দেশে বহন করে নিয়ে যেত। সে সময় নালন্দার অসামান্য শিক্ষক এবং অধ্যাপকদের মধ্যে ছিলেন শীলভদ্র, গুনমতি, চন্দ্রপাল স্থিরমোতি, চন্দ্রগোমিন প্রভৃতিরা। নালন্দার পরিচালনায় গণতান্ত্রিক রীতি-নীতি পদ্ধতি অনুসৃত হত, এর প্রধান সচিবকে বলা হত সর্বাধ্যক্ষ। জ্ঞানের অনন্ত গভীরতা, সাধনা, বয়স সমস্ত দিক বিবেচনা করে তাঁকে নির্বাচিত করা হত। সর্বাধ্যক্ষকে সহায়তা করার জন্য দুজন মহাস্থবির ধর্মাধ্যক্ষ নিয়োগ করা হত, এদের বলা হত কর্মদান এবং স্থবির।

নালন্দার পরীক্ষাব্যবস্থা এবং পাঠ সমাপনের পর উপাধিদানের ব্যবস্থা ছিল। এখানে পরীক্ষা পদ্ধতি ছিল প্রধানত মৌখিক। শিক্ষা শেষে শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ কৃতিত্বের পরীক্ষা দেওয়ার জন্য রাজসভাতে উপনীত হত। রাজসভা থেকে কৃতী ছাত্রদের 'স্থবির' 'বহুশ্রুত' ইত্যাদি উপাধি প্রদান করা হত।

আমাদের গর্বের বিষয় এটাই যে, আজ যখন সারা দেশ জুড়ে উচ্চশিক্ষার জগত মধ্য মেধায় আক্রান্ত তখন নালন্দার মেধা তীক্ষ্মতা আমাদের নতুন করে ভাবতে শেখায়, নতুন প্রত্যয়ে আশবাদী করে তোলে।

একজন সৃষ্টিশীল শিক্ষিকা ও আমেরিকার গ্রামে তাঁর বিদ্যালয়ের গল্প

১৯৩০ এর দশকে আমেরিকার বিদ্যালয়গুলির অবস্থা ছিল অনেকটাই বর্তমান ভারতীয় বিদ্যালয়গুলির মত। দূরবর্তী বেশিরভাগ বিদ্যালয়েই পরিকাঠামো বা সম্পদ বলতে কিছুই ছিল না। এর মধ্যে অনেকগুলি ছিল একজন শিক্ষিক-ভিত্তিক বিদ্যালয়। এটি একজন ভীষণভাবে আলোকিত ও উৎসাহপূর্ণ শিক্ষিকা জুলিয়া ওয়েবার গর্ডনের গল্প, যাঁকে 'শান্তিস্বরূপ' এমনই একটি বিদ্যালয়ে পাঠানো হয়। কিন্তু জুলিয়া আবদ্ধ থাকার পাত্রী ছিলেন না। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি পরিস্থিতিটি নিজ আয়ত্বে আনেন এবং নিজের উদ্ভাবনী দক্ষতা ও সমৃদ্ধি দিয়ে একটি উন্নততর ও বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতার সৃষ্টি করেন, যা শিশুদের মধ্যেও উদ্দীপনা জাগিয়ে তোলে, আর তাদের মধ্যে সেই বোধ আনে যে "বিদ্যালয় বাস্তব জগতেরই একটি অংশ, এটি এমন জায়গা নয় যেখানে তুমি আজ কিছু অর্থহীন কাজে যুক্ত হবে।" শিক্ষা প্রক্রিয়ার একজন নিরাসক্ত সমালোচক হিসাবে নয়, বরং এমন একজন, যিনি যত ঘোরালো পরিস্থিতি-ই হোক না কেন, যত কঠিন সমস্যাই হোক না কেন আশার আলো ছড়িয়ে একমাত্র প্রেরণাদায়ক শিক্ষাদানকারী রূপে একটি পৃথক জগত সৃষ্টি করতে সক্ষম। এই হল "একার ক্ষমতা।" এ কথা সত্য যে অট্টালিকা, সৌখিন আসবাবপত্র, শীততাপ নিয়ন্ত্রিত বাস, দামি কম্পিউটার ও ভাল ল্যাবরেটরি থাকলেই বিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠত্ব তৈরি হয় না। একটি বিদ্যালয় তার সব সেরা বিনিয়োগ করতে পারে একমাত্র শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্য দিয়ে। মিস ওয়েবার নিজের শিক্ষকতার জীবনে সেটাই প্রমাণ করেছিলেন তাঁর সৃষ্টিশীল দক্ষতা দিয়ে।

"বিদ্যালয় বাস্তব জগতেরই একটি অংশ, এটি এমন জায়গা নয় যেখানে তুমি আজ কিছু অর্থহীন কাজে যুক্ত হবে।"

১৯৩০-এর দশকে জুলিয়া ওয়েবারকে আমেরিকার দূরবর্তী এক প্রান্তের এক গ্রাম্য বিদ্যালয়ে পাঠানো হয়। ত্রিশ জনের বেশি শিশু নিয়ে গঠিত বিদ্যালয়ে তিনি ছিলেন একমাত্র শিক্ষিকা। পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সব বিষয় তাঁকেই পড়াতে হত। এই ঘটনার মধ্য দিয়েই বোঝা যায়, যখন সৎ সুযোগ ও স্বাধীনতা দেওয়া হয়, তখন একজন একাকী শিক্ষক বা শিক্ষিকা কতটা উন্নয়ন আনতে পারেন। তাঁর বিদ্যালয়টি ছিল ক্ষয়প্রাপ্ত, দরিদ্র, সর্বোপরি গ্রাম্য সমাজের ভিতর একটি ছোট্ট দূরবর্তী একটিমাত্র কক্ষের একটি গ্রাম্য বিদ্যালয়। অর্থবল খুব সামান্য থাকায় তিনি সেইসব শিক্ষণ-সামগ্রী বেছে নিতেন, যেগুলি তিনি ও তাঁর ছাত্রছাত্রীরা অথবা স্থানীয় হিতাকাঙ্ক্ষী সমাজ তৈরি করতে পারত।

১৯৩০-এর দশকে জুলিয়া ওয়েবারকে আমেরিকার দূরবর্তী এক প্রান্তের এক গ্রাম্য বিদ্যালয়ে পাঠানো হয়। ত্রিশ জনের বেশি শিশু নিয়ে গঠিত বিদ্যালয়ে তিনি ছিলেন একমাত্র শিক্ষিকা।

মিস জুলিয়া ওয়েবার-এর বিদ্যালয়ে বহু শিশুই শ্রেণীকক্ষে জ্বালাতন করত এবং অনেকেই ছিল ক্ষীণ বুদ্ধি সম্পন্ন, কিন্তু তিনি কখনও তাদের কারোর বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ করেন নি। তাঁর শ্রেণীগুলি ছিল বিভিন্ন বয়সের মিশ্রণ, বৈচিত্র্যপূর্ণ দক্ষতা ও ক্ষমতাসম্পন্ন শিশুদের নিয়ে গঠিত। কিন্তু তিনি বিশেষ প্রচেষ্টায় শিক্ষাকে উৎসাহদ্দীপক করে তুলেছিলেন, আর সে কাজে তিনি অত্যন্ত পারদর্শীও ছিলেন। তাঁর কাছে সকলেই গুণতে শিখল। তাঁর শ্রেণীতে প্রত্যেকেই বড় হল প্রত্যেকেই শিখল। তাঁর অভিজ্ঞতা একটি চলমান ধারণাকে ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করল যে - বড় বিদ্যালয়গুলি ভাল। বড় বিদ্যালয়গুলির আবেদন এটুকুই যে, তারা বিশেষ গবেষণাগার রাখে, তারা " বিশেষজ্ঞ" ভাড়া করে বিশেষ পাঠক্রমের ব্যবস্থা করে। মিস্ ওয়েবার আশি বছর আগে দেখিয়েছিলেন যে এর কোন প্রয়োজন নেই। এক মাসের মধ্যেই তিনি ও তাঁর ছাত্রছাত্রীরা দরিদ্র গ্রাম্য সমাজের একটি ছোট্ট বিদ্যালয়ে যে সুন্দর ও সমৃদ্ধতর শিক্ষার পরিবেশ গড়ে তুলেছিলেন, তা ছিল তাকিয়ে দেখার মত। আর সেই সঙ্গে বিদ্যালয়টিতে ছাত্র ছাত্রীদের চিন্তাভাবনাকে সক্রিয় করে তোলার জন্য উৎসাহদ্দীপক শিখন উপাদান সামগ্রীতে ভরা ছিল। আমরা জানি যে আজকের দিনে বহু সম্পদই সহজলভ্য – বিজ্ঞান কেন্দ্র, সচল পাঠাগার, সচল গবেষণাগার এবং অবশ্যই ইন্টারনেট, যা থেকে একজন সম্পদশালী শিক্ষক বহু তথ্য বের করতে পারেন। কিন্তু এই ধরণের কোনওরকম সাহায্য ছাড়া-ই মিস্ ওয়েবার এক অতি সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যময় শিক্ষার পরিবেশ রচনা করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

যখন তিনি বা তাঁর ছাত্রছাত্রীরা কোনও বই বা সরঞ্জামের প্রয়োজনীয়তা বোধ করতেন, তাঁরা চেষ্টা করতেন এমন কাউকে খুঁজে পেতে যাঁর কাছে তা আছে, আর পারলে তাঁরা সেটি ধার

করতেন। তাঁরা অন্যান্য বিদ্যালয়, রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়, রাজ্য কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, এবং ইয়র্কের শৈল্পিক চারুকলা সমবায় পরিষেবা – ইত্যাদি সাহায্য গ্রহণ করতেন। তাঁরা কিছু দক্ষ ছুতোর মিস্ত্রি পেয়েছিলেন যাঁদের সহায়তায় বড় ছাত্রছাত্রীরা অল্পবয়সী শিশুদের জন্য একটি খেলাঘর বানিয়েছিল। বিদ্যালয়টিতে খুব বেশি ভাল বই ছিল না। সেজন্য এক বছরের মধ্যে ঐ বিদ্যালয়ের শিশুরা স্থানীয় পাঠাগার থেকে সাতশোর বেশি বই ধার নেয় প্রতি বছর শিশুপিছু কুড়িটির বেশি বই। আমাদের বড় বড় বিদ্যালয়ের কয়েকটি মাত্র তাদের পাঠাগারকে এত ভালভাবে ব্যবহার করে। বেশিরভাগ বিদ্যালয়ের পাঠাগারের বই শিশুদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে থাকে তালা দেওয়া কাবার্ড-এর মধ্যে।

মিস ওয়েবার অনুভব করেছিলেন যে শিশুদের সমাজের বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষদের মধ্যে বেড়ে ওঠা উচিত, যাতে তারা অন্তত দেখতে, ভাবতে আর বুঝতে সুযোগ পায়।

মিস ওয়েবার অনুভব করেছিলেন যে শিশুদের সমাজের বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষদের মধ্যে বেড়ে ওঠা উচিত, যাতে তারা অন্তত দেখতে, ভাবতে আর বুঝতে সুযোগ পায়। তারা সব থেকে ভালভাবে শেখে আর বেড়ে ওঠে যখন তাদের বিদ্যালয় এমনই কোন সমাজের অংশ হয়, যখন তাদের শিক্ষা বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে, যখন তাদের শিক্ষা বিদ্যালয়ের বাইরের জগতের মানুষদের জীবন, কাজ, প্রয়োজন, সমস্যা - সবকিছু বারেবারে ছুঁয়ে যায়। তিনি বড়দেরও ঐ বিদ্যালয়ে আনতে ও তাঁদের অনুভব করাতে সক্ষম হয়েছিলেন যে এটা তাঁদের জীবনের একটি অংশ, কেবল একটি জায়গা নয় যেখানে তাঁরা তাঁদের সন্তানদের প্রতিদিন কয়েক ঘণ্টার জন্য ছেড়ে যান। অর্থাৎ তিনি বিদ্যালয়টিকে সমাজের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে গড়ে তুলে তাতে নতুন জীবন দান করেছিলেন।

মিস্ ওয়েবার শিশুদের মধে উৎসাহ জাগাতে ও তাদের দিয়ে কিছু আরম্ভ করাতে জানতেন। তিনি নিজেও হার্মনিকা ও পিয়ানো বাজাতে পারতেন, লোকনৃত্য করতে পারতেন, গান গাইতে পারতেন, খেলাঘর তৈরিতে সাহায্য করতেন, পুতুল নাচের পুতুল বানিয়ে নাচাতে পারতেন, অনেক রকম খেলা জানতেন, কাগজের তৈরি উইন্ডমিল বানাতে পারতেন, স্কেল দিয়ে ছবি আঁকতে পারতেন, বহু গাছ-গাছড়া চিনতেন, ভারতীয় নাচ করতে পারতেন, ফুল ফোটাতে পারতেন, প্রস্তর - বাগিচা রচনা করতে পারতেন, ভূ-তত্ত্ববিদ্যা সম্বন্ধে কিছু বলতে পারতেন, আর শিলা সনাক্ত করতে পারতেন, ভারতীয় উপকথা বলতে পারতেন, রান্না করতে পারতেন, লবণকে কেলাসিত করতে পারতেন, কাপড়ের টুকরো দিয়ে শিকে বানাতে পারতেন, খেলাঘরের জন্য আসবাবপত্র বানাতে পারতেন, ইজেলের পরিকল্পনা করে বানাতে পারতেন, বিভিন্ন বস্ত্র-উপাদান শনাক্ত ও তুলনা করতে পারতেন, মাটি দিয়ে কাজ করতে পারতেন, মাটির পাত্রাদি তৈরি করতে পারতেন, বিভিন্ন মাধ্যমে ছবি আঁকতে ও রঙ করতে পারতেন, জীবজন্তুদের পদচিহ্নের ছাপ নিতে ও তাদের কয়েকটিকে শনাক্ত করতে পারতেন, বিভিন্ন ভাষায় ভজন গাইতে পারতেন, সাধারণ তাঁতে বুনতে পারতেন, সুতোও কাটতে পারতেন। এই ছিল তাঁর সমৃদ্ধির ভান্ডার, যা তিনি বিদ্যালয়েও নিয়ে এসেছিলেন।

কালের বিবর্তনে হারিয়ে যাচ্ছে গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন খেলা

কালের বিবর্তনে হারিয়ে যাচ্ছে গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যবাহী অনেক প্রাচীন খেলা। বর্তমান প্রজন্ম ঝুঁকে পড়েছে কম্পিউটার মোবাইল গেমস সহ আধুনিক প্রযুক্তির দিকে।এক সময় গ্রামবাংলার আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অসংখ্য খেলা এখন আর চোখে পড়েনা। এ যুগের ছেলে-মেয়েরা পিতা-মাতার কাছে মারবেল কিংবা ঘুড়ি কেনার বায়না ধরে না। কাঁদতে দেখা যায় না লাটিম কিনে দেওয়ার জন্য। বর্তমান প্রজন্ম এখন গ্রামীণ খেলার সাথে একেবারেই অপরিচিত। যে সকল খেলা বর্তমান প্রজন্মের ছেলে-মেয়েদের খেলতে দেখা যায়, তার মধ্যে হলো কম্পিউটার, মোবাইল গেমস, ক্রিকেট সহ আধুনিক সব খেলা। অথচ এক সময় গ্রাম বাংলার অসংখ্য খেলার মধ্যে ছিল হা-ডু-ডু, ফুটবল, কানামাছি, গোল্লাছুট, বুড়িচোরি, এক্কাদোক্কা, কানামাছি, কিত কিত, লাটিম, ঘুড়ি উড়ানো, কাঁচেরগুলি, একে ইন্দুর, গুলতি, পিপুলটি গুলি, লুকোচুরি, বউ চি, চোর-ডাকাত পুলিশ, চোকপালান্তি, হাড়িভাঙ্গা, নাকড়িখেলা, লাঠিখেলা, কইডাঙ, দড়িঝাপ, হেড়েফেড়েডাঙ, নদী-পুকুরে ঝাপুড়ি, ভাটাম, পাঁচ গুটি, কলাপতি, বউ-জামাই, কাদাছোড়াছুড়ি, কপালে টিপ দিয়ে যা, পুতুল খেলা, পুতুলের বিয়ে, হাউই, বেলুন, পিছল, গুলির শাল,গাছের ডালে দোলনা ইত্যাদি গ্রাম-বাংলার ঐতিহ্যে লালিত অসংখ্য খেলাধুলা। বিকেল হলেই মেয়েদের দেখা যেত এই রকমের নানা খেলা খেলতে। আর ছেলেরা খেলত ডাংগুলি, মারবেল, ঘুড়ি উড়ান ইত্যাদি খেলা। তাছাড়া এক সময় ডানপিটে ছেলেদের খেলা হিসেবে পরিচিত ছিল লাটিম খেলা। তবে বর্তমান প্রজম্ম এইসব ঐতিহ্যবাহী খেলাধুলার সাথে একেবারেই অপরিচিত। তাদের কাছে এগুলো রূপকথার গল্প মনে হয়। স্কুলের মধ্যে দিয়ে যদি ফিরিয়ে আনা যায় এই ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন খেলাগুলি, তাহলে তা আগামী প্রজন্মের হাত ধরে টিকে থাকবে আরও বহু দিন।

সৃজনের বিকাশে সৃজনের মেলা

৪নং বোয়ালদাড় গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে এক অভিনব উদ্যোগ

ছোট্ট কুঁড়ি যখন প্রস্ফুটিত হয়ে ফুলে পরিণত হয়, তখনই তা সার্থকতা লাভ করে, সকলের মাঝে সমাদৃত হয়। ঠিক সেভাবেই আদর্শ শিক্ষায় বিকশিত হয় চিন্তাশক্তি, বৃদ্ধি পায় সৃজন ক্ষমতা। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাদর্শনে নিহিত রয়েছে সেই আদর্শ শিক্ষার মূলমন্ত্র। যা আমাদেরকে স্কুলের চার দেওয়ালের গন্ডি থেকে পাঠ্যসূচিকে মুক্ত করে শিশুদের হাতে-কলমে পাঠদানের শিক্ষা দেয়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই শিক্ষা-ভাবনাকে সামনে রেখে বছর দুই আগে আনন্দপাঠের মধ্যে দিয়ে শিশুদের সৃজনশক্তিকে আরও বিকশিত করতে উদ্যোগী হয় বালুরঘাট ব্লকের ৪নং বোয়ালদাড় গ্রাম পঞ্চায়েত। পঞ্চায়েত এলাকার বিভিন্ন স্কুলে শুরু হয় নানাবিধ কর্মকাণ্ড। স্কুলে স্কুলে শিশুদের দিয়ে নার্সারি ও পুষ্টি বাগান করানোর পাশাপাশি পুষ্টি ম্যাপিং, শিক্ষামূলক পরিদর্শন, এল সি ডি –র মাধ্যমে শিক্ষাদান এবং পঞ্চায়েত মনোনীত স্থানীয় ব্যক্তিদের সাহায্যে সৃজনমূলক ও শিল্পকলা শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। অবশেষে চলতি বছরের ১১ মে বোয়ালদাড়ের খাসপুর হরেকৃষ্ণ উচ্চবিদ্যালয় প্রাঙ্গণে পূর্ণাঙ্গ রূপ পেল তাদের সেই প্রয়াস। বোয়ালদাড় গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে এবং অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্স্-এর প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য 'স্পার'-এর সহযোগিতায় এলাকার আটত্রিশটি স্কুলকে নিয়ে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল সৃজন মেলা।

ছাত্রীদের নাচ

ছাত্র-ছাত্রীদের নাটক

শুরুতেই প্রদীপ জ্বালিয়ে মেলার আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন রাজ্যের প্রাক্তন স্বাস্থ্য সচিব তথা অর্থ-কমিশনের বর্তমান সদস্য শ্রী দিলীপ ঘোষ। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-ভাবনায় অনুপ্রাণিত হয়ে এধরনের মেলার আয়োজন করার জন্য ৪ নং বোয়ালদাড় গ্রাম পঞ্চায়েতকে সাধুবাদ জানান, বালুরঘাটের ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক শ্রী শুভ্রজিৎ গুপ্ত। আগামী দিনেও এভাবেই পথ চলার অঙ্গীকারের কথা বলেন, ৪ নং বোয়ালদাড় গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শ্রী পিন্টু বসাক। এছাড়াও এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ শ্রীমতী অনিমা মণ্ডল, বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক) শ্রী আবদুর রহমান শেখ, কলকাতাবিশ্ববিদ্যালয়েরঅ্যাসোসিয়েটেড প্রফেসর শ্রী নবীনানন্দ সেন, সিলেবাস কমিটির প্রাক্তন সদস্য শ্রী দেবাশিস মণ্ডল, অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্স্- এর তরফে শ্রী আবির চক্রবর্তী ও শ্রী রত্নদীপ দে।

ছাত্র-ছাত্রীদের হাতের কাজ

পৃথ্বা সরকারের উদ্বোধনী সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে শুভারম্ভ হয় অনুষ্ঠানের। এরপর দিনভর মেলার মঞ্চ মাতিয়ে রাখে বোয়ালদাড়ের আটত্রিশটি স্কুলের বিভিন্ন বয়সের পড়ুয়ারা। গান, নাচ, আবৃত্তি, নাটক ও শ্রুতি নাটকের মধ্যে দিয়ে তাদের সৃজন প্রতিভার পরিচয় দেয়। পশ্চিম কৃষ্ণপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছোট ছোট পড়ুয়াদের আদিবাসী নৃত্যমেলা উপস্থিত সকলের নজর কাড়ে। প্রিয়াঙ্কা সোরেন, রাজাপুর শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের এই ছাত্রীর কণ্ঠে ইংরাজিতে নির্ভুল ছড়া শোনাটা নিঃসন্দেহে ছিল এক বড় প্রাপ্তি। মেলা-মঞ্চে যৌথভাবে আবৃত্তি পরিবেশন করে দোগাছি প্রাথমিক বিদ্যালয়। একই বিভাগে যথেষ্ট শিল্প-প্রতিভার পরিচয় দেয় ভারেণ্ডা শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের পড়ুয়ারা। মেলায় সকলের হাততালি আদায় করে নেয় দুর্লভপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্ষুদে ছাত্রীদের সমবেত নৃত্য ও বরুণা বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্রী কবিতা মণ্ডলের একক নৃত্য পরিবেশনা। মেলায় আমন্ত্রিত স্কুল হিসেবে উপস্থিত ছিল পার্শ্ববর্তী তপন ব্লকের চেঁচাই প্রাথমিক বিদ্যালয়। অণুনাটক 'বন্ধু' উপহার দেয় ওই স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা। এছাড়া সৃজন মেলায় ব্রহ্মপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তরফে মঞ্চস্থ হয় 'পরিবর্তন', কালিকাপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের 'ডাকঘর', খাসপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নাটক 'আলো' কিংবা দোগাছি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও বরুণা বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের শ্রুতি নাটক দুটি ছিল বেশ মনোজ্ঞ। মেলায় স্কুলগুলির জন্য বিভিন্ন স্টলেরও

আয়োজন করা হয়েছিল। যেখানে নিজেদের আঁকা ছবি, হাতের নানাবিধ কাজের পাশাপাশি স্কুল-বাগানে উৎপাদিত নানারকম সবজির পসরা নিয়ে হাজির হয়েছিল ক্ষুদে পড়ুয়ারা।

মেলা চলাকালীন অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন স্কুলের ছোট ছোট ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ দিতে সেখানে হাজির হয়েছিলেন দক্ষিণ দিনাজপুরের তপন বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক শ্রী বাচ্চু হাঁসদা, বালুরঘাট পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রী প্রবীর কুমার রায়, ডিপিআরডিও সৌরভ সেনগুপ্ত এবং জেলা পরিষদ কর্মাধ্যক্ষ বিশ্বনাথ পাহান।

মেলা শেষে ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন শিল্প-প্রতিভা ও সৃজন ক্ষমতার বিচারে ৪ নং বোয়ালদাড় গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন স্কুলকে পুরস্কৃত করা হয়। বিচারকদের নজরে প্রথম হয় ব্রহ্মপুর প্রাথমিক স্কুল। দ্বিতীয় হয় ওসাইল প্রাথমিক স্কুল এবং তৃতীয় স্থান দখল করে নেয় খাসপুর হরেকৃষ্ণ উচ্চবিদ্যালয়।

তবে ছোটদের এই সৃজন মেলায় বাড়তি পাওনা ছিল বালুরঘাটের শ্রী নির্মলকুমার আগরওয়ালের ব্যক্তিগত সংগ্রহশালার এক অনবদ্য প্রদর্শনী। বিভিন্ন সময়ের কাগজের নোট, বই, বাংলা দলিল, শতাব্দী প্রাচীন গ্রামোফোন, ক্যামেরা কিংবা দৈনন্দিন ব্যবহারের নানান জিনিস, কী ছিল না ওই প্রদর্শনীতে! খাসপুর হরেকৃষ্ণ উচ্চ বিদ্যালয়ের ছোট্ট একটি ক্লাসঘর এদিন মেলামাঠে উপস্থিত সকলকে যেন টাইম মেশিনে চড়িয়ে কয়েক মুহূর্তের জন্য বিগত কয়েক শতাব্দীতে নিয়ে গিয়েছিল।

এলাকার ছাত্রছাত্রীদের সৃজন ক্ষমতা ও শিল্প প্রতিভা প্রকাশের এই মঞ্চ এককথায় ছিল এক অভিনব আয়োজন। নিজের গ্রামের ছোট ছোট শিশুদেরকে নতুন করে আবিষ্কার করলেন তাদেরই চেনা প্রতিবেশী পরিজনেরা। তাই এখন তাঁরাও চান আগামী দিনে এভাবেই তাঁদের শিশুদের নানান প্রতিভা বিকাশের লক্ষ্যে কাজ করে যাক ৪ নং বোয়ালদাড় গ্রাম পঞ্চায়েত।

বালুরঘাট পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে

সারাদিনব্যাপী আলোচনা ও ভাবনা বিনিময়ঃ একটি প্রতিবেদন

সম্প্রতি "রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা দর্শন ও জাতীয় পাঠক্রম রূপরেখার (২০০৫) প্রেক্ষিতে তার প্রাসঙ্গিকতা এবংঅডিও-ভিসুয়ালেরপ্রয়োজনীয়তা ''শিরোনামে সারাদিনব্যাপী একটি আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়েছে । দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সদর শহর বালুরঘাটে অবস্থিত নাট্যতীর্থ (মন্মথ মঞ্চ) গত ১২ই মে ২০১৫ তারিখে এই আলোচনাচক্রটি অনুষ্ঠিত হয়। প্রচলিত গতানুগতিক ও যান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তে বিকল্প একটি নতুন দিগনির্দেশের ক্ষেত্রে উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক চিন্তাভাবনা বিনিময়ের উদ্দেশ্যেই এই আলোচনাচক্রের আয়োজন। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভসের প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য সোসাইটি ফর পার্টিসিপেটরি অ্যাকশন অ্যান্ড রিফ্লেকসন(স্পার)এর সহযোগিতায় এটি অনুষ্ঠিত হলেও এই আলোচনাচক্রের মূল উদ্যোক্তা ছিলেন বালুরঘাট পঞ্চায়েত সমিতি। সারাদিনব্যাপী এই আলোচনাচক্রে উপস্থিত ছিলেন বালুরঘাট ব্লকের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ, শিশুশিক্ষা কেন্দ্রগুলির সহায়কবৃন্দ এবং বালুরঘাট পঞ্চায়েত সমিতির পদস্থ আধিকারিকবৃন্দ। তাঁরা প্রত্যেকে এই আলোচনাচক্রের উদ্যোগকে স্বাগতম জানান। এই আলোচনা সভায় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মহকুমা শাসক শ্রী সন্দীপ দত্ত, বালুরঘাটের ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক শ্রী শুভ্রজিৎ গুপ্ত, বালুরঘাট পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রী প্রবীর রায়, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ডিসট্রিক্ট প্রাইমারি স্কুল কাউন্সিলের চেয়ারম্যান শ্রী কল্যাণ কুণ্ডু, বালুরঘাট পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ শ্রীমতী অণিমা মণ্ডল, বালুরঘাট পঞ্চায়েত সমিতির সমিতি এডুকেশন অফিসার শ্রী সুজিত কুমার পাল, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রী নবীনানন্দ সেন, বিশিষ্ট শিক্ষক ও সিলেবাস কমিটির প্রাক্তন সদস্য শ্রী দেবাশিস মণ্ডল, অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভসের চেয়ারম্যান শ্রী আবীর চক্রবর্তী, অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভসের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রী রত্নদীপ দে এবং শ্রী আব্দুর রহমান সেখ (এস আই অফ স্কুলস,বালুরঘাট ওয়েস্ট সার্কেল) প্রমুখ। সভায় উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে সবাই নিজ নিজ মতামত প্রকাশের মাধ্যমে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার প্রেক্ষিতে রবীন্দ্র শিক্ষা দর্শন ও জাতীয় পাঠক্রম রূপরেখা

২০০৫-এর প্রাসঙ্গিকতা স্বীকার করেন। এই প্রাসঙ্গিকতা স্বীকার করার মাধ্যমে স্বাভাবিকভাবেই বিশিষ্ট শিক্ষক ও সিলেবাস কমিটির প্রাক্তন সদস্য শ্রী দেবাশিস মণ্ডলের আন্তরিক স্বীকারোক্তিঃ "পাঠ্যক্রম পরিবর্তন করতে পারলে শিশুদের যদি প্রকৃত শিক্ষা দিতে পারি, তাহলে বোধহয় আমরা কিছুটা ভারমুক্ত হতে পারব। ভারবাহী শিখনের মাধ্যমে অনেক কিছু শিখলাম কিন্তু কোথায় যাচ্ছি কেউ জানিনা।"স্বাভাবিকভাবেই শ্রী দেবাশিস মণ্ডলের খেদোক্তিঃ "যে শিক্ষা দিয়ে রুটিও তৈরি করতে পারিনা, কাপড়ও তৈরি করতে পারিনা, মকানও তৈরি করতে পারিনা-এই ভারবাহী শিখন নিয়ে আমরা কি করব?" ডি পি এস সি র চেয়ারম্যান শ্রী কল্যাণ কুণ্ডু তাঁর স্বকীয় ভঙ্গিতেই বলেন, "যে মালি বাগান পরিচর্যা করে, যে মালি রুক্ষ মাটিকে উর্বর করে তোলে, যে মালি বাগানে ফুল ফোটায়, শিক্ষকদেরকে সেই মালি হয়ে উঠতে হবে।" প্রাসঙ্গিক আলোচনায় বোয়ালদাড় গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বেশ কয়েকজন শিক্ষকও এদিন তাঁদের মতামত পেশ করেন। বালুরঘাটে অনুষ্ঠিত এই আলোচনাসভায় কালচিনি পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ শ্রী প্রেম লামা এবং দিনহাটা ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ শ্রী জিল এক্রাম উভয়েই জাতীয় পাঠক্রম রূপরেখা ২০০৫ কে সামনে রেখে নিজ নিজ পঞ্চায়েত সমিতি এলাকায় শিক্ষা ক্ষেত্রে কি কি উদ্যোগ নিয়েছেন তার বিস্তৃত বিবরণ পেশ করেন এবং সেই বিবরণের মধ্য দিয়ে তাঁদের স্বপ্নের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরেন।

এদিন স্বাগত ভাষণে বালুরঘাটের ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক(বিডিও) শ্রী শুভ্রজিৎ গুপ্ত বলেন যে এই আলোচনাচক্র সরকারী উদ্যোগ নয়, তবু বালুরঘাট পঞ্চায়েত সমিতি এই উদ্যোগ নিয়েছে। কারণ বালুরঘাট ব্লক উদ্ভাবনী কর্মসূচীতে বিশ্বাস করে এবং সেই অনুযায়ী এই আলোচনাচক্রের আয়োজন। এই আলোচনাচক্রের প্রাসঙ্গিকতায় শ্রী শুভ্রজিৎ গুপ্ত আরও বলেন যে এই ধরণের আলোচনা সভা বা প্রোগ্রামগুলি শেষ অব্দি সরকারী কর্মযজ্ঞকেই শক্তিশালী করে। এদিনের এই সভার যৌক্তিকতা বিচার প্রসঙ্গে শ্রী গুপ্ত আরও বিস্তৃত ভাবে বলেনঃ "অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভস ও স্পারের সহযোগিতায় বোয়ালদাড় গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে গতকাল যে সৃজন মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে, সেই মেলার মধ্য দিয়েও আমরা বুঝতে পারি যে শুধুমাত্র পাঠ্যপুস্তকের মধ্য দিয়ে শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়না। তাই রবীন্দ্র শিক্ষা দর্শন অনুসারে এই সভা আয়োজনের ক্ষেত্রে আমরা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছি। "শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধিতে এই আলোচনাসভা বিশেষ সহায়ক হবে বলে শ্রী গুপ্ত এদিন আশা প্রকাশ করেন। এই ধরণের আলোচনাসভার আয়োজন করার জন্য বালুরঘাট পঞ্চায়েত সমিতিকে বিশেষ ধন্যবাদ জানান মহকুমা শাসক শ্রী সন্দীপ দত্ত।

প্রাসঙ্গিক শিক্ষার বিস্তারে ভ্রমণের প্রাসঙ্গিকতা

কেন শিক্ষামূলক ভ্রমণ -পাঠ্যপুস্তকে পড়া বা কানে শোনা কোনও বিষয় যদি সরেজমিনে চাক্ষুস করা যায় তবে সেই শিক্ষা সহজেই আত্মস্থ করা সম্ভব। মননেও দীর্ঘস্থায়ী হয় সেই উপলব্ধি। তাই আদর্শ শিক্ষায় এমন পরিদর্শনের ভূমিকা অপরিসীম। চিরন্তন এই সত্যকে স্বীকৃতি দিয়ে ২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ কমিটি তার অন্তর্বর্তী সুপারিশে তাই শিক্ষামূলক পরিদর্শনের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়।

ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে অযোধ্যা ভ্রমণ – বাঘমুন্ডির ভূরশু গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে নেতাজি মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্র ও রেলাকুড়রা উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২৫ জন ছাত্রছাত্রীকে নিয়ে গত ৮ই মার্চ অযোধ্যা পাহাড়ে এমনই এক শিক্ষামূলক পরিদর্শনের আয়োজন করা হয়েছিল। শুধু তাই নয়, ভ্রমণ থেকে ফিরে অষ্টম শ্রেণীর পড়ুয়া উষারানি মাহাত, অনামিকা মুড়া, মানিক চন্দ্র কুমার, ধীরজ সাউ ও চন্দন সাউ তাদের নিজেদের স্বাভাবিক ভাষায় সেই অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করে। তার মধ্যে একটি লেখাকে সামান্য কিছু সম্পাদনা করে এখানে তা প্রকাশ করা হলঃ

অযোধ্যা ভ্রমণের অভিজ্ঞতা

পুরুলিয়ার বাঘমুন্ডির ভূরশু গ্রামের নেতাজি মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্রের ২৫ জন ছাত্রছাত্রীকে নিয়ে গত ৮ মার্চ ২০১৫ তারিখে (রবিবার) সেখানকার গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে একটি শিক্ষামূলক ভ্রমণের আয়োজন করা হয়েছিল। সকাল ১০টার সময় আমরা সকলে বিদ্যালয়ের সামনে উপস্থিত হই। এরপর ১০.৪০ মিনিট নাগাদ গাড়িতে চেপে আমরা অযোধ্যার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করি। প্রথমে আমরা অযোধ্যা মোড়ে নামি এবং

সামান্য জলপান করার পর আবার গাড়িতে উঠি। তারপর আমরা যাই লোয়ার ডেমে। সেখানে কিছুটা সময় কাটিয়ে আমরা ফের গাড়িতে চড়লাম। সেখান থেকে আমাদের পরের গন্তব্য ছিল আপার ডেম। দেখলাম, ২৫০ ফুট নীচে টারবাইনের চাকা ঘুরিয়ে কীভাবে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয়। এরপর সেখান থেকে আমরা চলে যাই ফরেস্টার অফিসে। সেখানে দেখা পেলাম ফানেলের মতো পাতা বিশিষ্ট কৃষ্ণবট গাছের। জানা গেল, অযোধ্যায় নাকি এখন এই গাছ একটিই রয়েছে। তারপর ওখানে বিশল্যকরণী গাছ, খয়েরি গাছের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়। ফরেস্টারের এক আধিকারিক এরপর আমাদেরকে একটি বাড়িতে নিয়ে যান, যেখানে আমরা কাঁচের ভিতরে অদ্ভুত সুন্দর নকশা দেখতে পাই। দেখতে পাই কীভাবে আপার ডেমে গাড়িগুলো উঠছে নামছে, এছাড়া অযোধ্যার জঙ্গলে কত রকম বন্যপ্রাণী আছে ইত্যাদি নানান কিছু। এরপর সেখান থেকে আমরা সকলে অযোধ্যার একটি হোটেলে গিয়ে উঠি। খাওয়া-দাওয়ার পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে পায়ে হেঁটে আমরা আশেপাশে বেড়াতে শুরু করি।রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে দেখলাম পাশেই একটা বড় ফুটবল খেলার মাঠ রয়েছে। পথেই দেখলাম নীহারিকা ও মালবিকা নামের দুটি বড় হোটেল। সেখান থেকে কৃত্তিবাস আশ্রম যাওয়ার পথে কলা বাগান, কুল বাগান, আম বাগান ইত্যাদি বাগান দেখতে পেলাম। কৃত্তিবাস আশ্রমের ভিতরে গিয়ে দেখলাম, গোটা মন্দিরটি তৈরি কাঠ দিয়ে। আর মন্দিরের ভিতরে রয়েছে মা দুর্গার প্রতিমা। কী আশ্চর্য ঘটনা, যেদিন থেকে মা দুর্গা এখানে প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন সেদিন থেকে মায়ের হাতের ওই প্রদীপ নেভেনি। তারপর আমরা পায়ে হেঁটে বুড়বুড়ি তাড়ি যাই। বিজ্ঞানসম্মতভাবে একে প্লবতা বলে। আশ্চর্য, দেখলাম জলের ভিতরের বালি আপনা-আপনি ফুটছে। বুড়বুড়ি তাড়ি থেকে আমাদের পরের গন্তব্য ছিল রামমন্দির। জায়গাটা একদিকে যেমন শান্ত তেমনই খুব সুন্দর ও পরিষ্কার। সেখানে প্রণাম জানিয়ে আমরা গাড়িতে করে লোহরিয়া নেমে আসি। শিব ঠাকুরের দর্শন সেরে এবার ফেরার পালা। সারাদিন অনেক ঘোরাঘুরির পর গাড়ি চেপে বাড়ি ফেরার পথেও আমরা ভীষণ আনন্দ পেয়েছিলাম। শেষে বড়তলে নেমে আমরা যে যার বাড়ি চলে যাই।

বিদ্যালয়সমূহের নতুন পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী সম্পর্কে অর্ন্তবর্তী প্রস্তাব কিছু নির্বাচিত অংশ

(বিদ্যালয় পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী বিষয়ক বিশেষজ্ঞ কমিটি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২০১১)

(৯) পাঠক্রমটিকে জীবন্ত ও আকর্ষণীয় করে তুলতে ..... নতুন নতুন পাঠ আনা হয়েছে। প্রতিটি শ্রেণীতে পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচীতে শিশুদের জন্য যথেষ্ট খোলা পরিষর রাখা হয়েছে যা স্থানীয় এবং প্রাসঙ্গিক ভাবনা দিয়ে পরিপূরণ করতে হবে শিক্ষককেই। অন্যদিকে এমন অনেক নতুন প্রাসঙ্গিক বিষয়ভাবনা আনা হয়েছে যা শিশুদের কাছে কৃত্যালির মধ্য দিয়ে সহজে উপস্থাপনা করা যায়, যেমন পঞ্চায়েতিরাজের ইতিহাস ও তার বর্তমান পরিস্থিতি .....গ্রাম সমীক্ষা ও গ্রাম সংগঠন ইত্যাদি।

(পৃষ্ঠা নং- ৭)

.....অভিভাবকদের সাথে সভা, ... শিশুদের জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা, স্থানীয় ভৌগলিক পরিবেশ, প্রাচীন নিদর্শণ নিয়ে কাজ, বাড়ির কাজের নমুনা তৈরী ..... কিছুটা সময় শিক্ষককে ব্যয় করতেই হবে।

সর্বোপরি হাতে নাতে কাজ (অপঃরারঃু নধংবফ ষবধৎহরহম) ও শিখনের ভাবনা মাথায় রেখে শ্রেণীকক্ষ পরিচালনা করতে হবে।

(পৃষ্ঠা নং- ৮)

১.২ বিদ্যালয়ে মিশ্র সংস্কৃতি : ভারতের মতো দেশে বৈচিত্র্যের বাতাবরণ এত বেশি ..... সাংস্কৃতিক ভিন্নতা থাকা স্বাভাবিক ..... এমনকি একই গ্রামে ভিন্ন সংস্কৃতিকযুক্ত জনগোষ্ঠীরা একসঙ্গে বসবাস করেন। ..... এই যে ঐক্যের সুর এবং তার শক্তি এটাও ভারতীয় গণতন্ত্রের একটা কেন্দ্রীয় দিক। ..... বিভিন্ন ভাষাভাষী, ধর্ম, জাতি, সংস্কৃতিযুক্ত এই রাজ্যের বিদ্যালয়গুলি ক্ষুদ্র সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মতো।

(পৃষ্ঠা নং- ২৪)

১.৩ (ক) সু-স্বাস্থ্য এবং পুষ্টির প্রয়োজনীয়তা : সুস্বাস্থ্য দেশ গঠনের আবশ্যিক পূর্বশর্ত আবার সু-স্বাস্থ্যের ভিত্তি হল পুষ্টি। শিক্ষার উপলব্ধিতেও পুষ্টির ভূমিকা বিরাট.....পুষ্টি নিয়ে শিশুদের মধ্যে ধাপে ধাপে একটা পরিস্কার ধারণা গড়ে তোলা দরকার ..... এই সংযোগটি যাতে তারা নিজের চোখে দেখতে পারে সেজন্য পাঠক্রমের মধ্যে কিছু ব্যবহারিক দিক যোগ করতে হবে.....এক কথায় স্বাস্থ্য ও পুষ্টির দিকটাকে শিক্ষার সাধারণ পাঠক্রম ও কৃত্যালির মধ্যে বৈজ্ঞানিক ভাবে সংযুক্ত করার কাজ হাতে নিতে হবে।

(পৃষ্ঠা নং- ২৭)

১.৪.২. শিশুর নিজের পাড়া, গ্রাম, এলাকা এবং জেলার পরিবেশ সম্পর্কে ..... তথ্য, নিদর্শণ ও অভিমত সংগ্রহ করে শিক্ষক একটি পাঠক্রম তৈরী করবেন। এক্ষেত্রে শিশুদের সাহায্য নিয়ে তিনি এই প্রক্রিয়া চালাবেন। এলাকা পরিদর্শণ ..... পুরানো নিদর্শণ দেখা ..... এই বিষয়ে গুরুত্ব বিশেষণ ..... ইত্যাদির মাধ্যমে একটি জীবন্ত পাঠক্রম তৈরী করবে এবং স্থানীয় পরিবেশ নিয়ে চর্চা করবে শিশুরা।

(পৃষ্ঠা নং- ২৮)

১.৬.৫. মহাপুরুষের জীবনের গল্প আত্মচরিত শোনা, বলা ও পাঠ করার মাধ্যমে শিশুর কাছে একটি লক্ষ্য ও আদর্শ স্থাপন জরুরী। স্থানীয় কৃতি মানুষ যারা বিভিন্ন বিষয়ে সাফল্য পেয়েছেন .....তাদের ডেকে এনে শিশুদের গল্প শোনাতে হবে, তাদের কাজ দেখাতে হবে..... গড়পশ চধহপযধুধঃ, নাটক, নাচ ..... নিয়মিতভাবে স্থান দিতে হবে.....প্রাথমিকে সমগ্র শিক্ষাক্রমের ৫০ ভাগ ও উচ্চ প্রাথমিকে ৪০% কৃত্যালির মধ্যে সংযুক্ত করা প্রয়োজন বলে কমিটি মনে করে ।

(পৃষ্ঠা নং- ৩১)

১.১১.১. স্বাস্থ্য ও শরীরচর্চা, সৃজনমূলক ও কর্মমূলক পাঠ ও শিল্পকলার চর্চা : .....পাঠক্রমে প্রাথমিকে শিশুর শরীরচর্চা ও সৃজনমূলক বা কর্মমূলক কৃত্যালির উলেখ থাকলেও.....তার গুরুত্ব হ্রাস পেতে পেতে .....এক অবহেলিত কৃত্যসূচী হিসাবে টিকে আছে। ..... পাঠ্যক্রম ও পাঠ্য ও কৃত্যসূচী অনেকাংশে শিশুর আনন্দ আকর্ষণ.....স্ব-শিখণের নীতিতে বিশ্বাসী তাই .....সৃজনশীল কৃত্যসূচীর গুরুত্ব নতুন শিক্ষাক্রমে অনস্বীকার্য। .....কর্মমুখী কৃত্যালিগুলিকেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

(পৃষ্ঠা নং- ৪৪, ৪৫)

.....প্রাথমিকে এই কর্মসূচীটি যে কোনো শিক্ষকই প্রশিক্ষণের পর শ্রেণীকক্ষ পরিচালনায় ব্যবহার করতে পারবেন। ..... ঐ এলাকায় বসবাসকারী .....কৃতি যুবক বা মানুষকে বিদ্যালয়ে আহ্বান করে এই বিষয়গুলির চর্চাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। মনে রাখতে হবে এই চর্চাগুলি শিশুর মধ্যে মূল্যবোধ গড়ে তুলবে। তবে মনে রাখতে হবে এখানে কোনো পেশাদার মানুষকে বিদ্যালয়ে চাকরি দেওয়া এই কর্মসূচীর লক্ষ্য নয়। তবে ..... এই বিষয়ে উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে।

(পৃষ্ঠা নং- ৪৪, ৪৫)

১.১১.৩. সমকালীন বিষয়সূচির অন্তর্ভুক্তি করাও যে জরুরী তা কমিটি মনে করে। এই কথা বিবেচনা করে কমিটি সুপারিশ করেছে যে .....পঞ্চায়েতিরাজ.....মিডিয়ার ভূমিকা..... এবং বিভিন্ন ক্ষেত্র যেমন অঙ্কন, সংগীত..... এবং দেশসেবায় অগ্রণী মানুষদের জীবন ও কর্মের মত বিষয় যুক্ত করা যেতে পারে। .....এসব বিষয়ে যাতে শিশুরা মুক্তমনে তথ্য সংগ্রহ করতে পারে এবং তাকে শিক্ষার অঙ্গনে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে পারে তা দেখতে হবে।

(পৃষ্ঠা নং- ৪৬)

১.১.৩.৯ ..... শিক্ষার্থীর উপর মূল্যবোধের নীরস উপদেশাবলী চাপিয়ে না দিয়ে কাজের মধ্য দিয়ে ছবি আঁকা, গান, গল্প বলাবলি, বিতর্ক, সমবেত সমবেত বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় এই মূল্যবোধের চর্চা সারা বছর ধরে করাতে হবে। ..... বিদ্যালয়ের গ্রেডিং করার সময় অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক এই বিষয়টিকে বিশেষভাবে নজর দেবেন।

(পৃষ্ঠা নং- ৫০)

১.১.৪.১ বিষয়বস্তুর তথ্যভিত্তিক চর্চার আধিক্য কমিয়ে পাঠ্যসূচিকে শিশুদের অভিজ্ঞতা ও দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে অঙ্গীভূত করার চেষ্টা।

(পৃষ্ঠা নং- ৫৪)

১.১.৪.৫ .....শিশুর হাতেনাতে কাজ বিভিন্ন সমীক্ষা, প্রজেক্ট ওয়ার্ক, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক ও সৃজনমূলক উৎপাদনাত্মক কাজ এর বিবিধ কাজ নিবিড়ভাবে সংযুক্ত করতে হবে। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, শিল্পকলা চর্চা, সৃজনমূলক ও উৎপাদনাত্মক কাজগুলিকে বিচ্ছিন্ন কোনো সহপাঠক্রমিক বিষয় হিসাবে না দেখে সেগুলিকে পাঠক্রমিক কর্মসূচিতে বিবর্তিত করতে হবে।

(পৃষ্ঠা নং- ৫৪)

২.৯. ..... এখানে শিক্ষক, পিতা-মাতা, পঞ্চায়েত, প্রধান শিক্ষক এবং অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক ও শিক্ষা সহায়কদের একটি যৌথ পরিচালন ব্যবস্থায় গড়ে উঠবে উন্নয়নের পরিমন্ডল। বিদ্যালয় উন্নয়ন পরিকল্পনা সহ সমস্ত প্রয়োজনীয় কৃত্যাদি এখানে যুক্ত হয়ে পড়বে সমস্ত ব্যবস্থাপনায়।

(পৃষ্ঠা নং- ৬১)

১.১৪.১৬. সামাজিক সহযোগিতায় গড়ে উঠবে শিখনের সামগ্রিক পরিমন্ডল, তাই শিক্ষাক্রমে অর্ন্তভুক্তি ঘটাতে হবে স্থানীয় সংস্কৃতি, শিল্প, কারিগরী দক্ষতা ..... সমীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ .....প্রচেষ্টা। এগুলি সামগ্রিক শিক্ষাক্রমের মধ্যেই সুসংহত (রহঃবমৎধঃবফ) থাকবে ফলে এজন্য পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচিতে ও সময় ও পরিসর খোলা রাখতে হবে।

(পৃষ্ঠা নং- ৫৬)

(ছ) উপরন্ত মূল্যবোধের শিক্ষা, শান্তির জন্য শিক্ষা, শিশুর মধ্যে গড়ে ওঠা কিছু গুণাবলীর চর্চাকে সুদৃঢ় করতেও ভাষাচর্চার সঙ্গে সঙ্গে শিল্পকলার চর্চা, সৃজনমূলক কাজ ও শরীর ও স্বাস্থ্যচর্চা যুক্ত করতে হবে। ..... স্থানীয় মন্দির-মসজিদের কাহিনী শোনা, স্থানীয় ইতিহাস খুজে বার করার অভিজ্ঞতামূলক পাঠ যুক্ত করতে হবে ..... পার্শ্ববর্তী পাহাড়, জঙ্গল.....সম্পর্কে তার অসীম রহস্যবোধকে পরিতৃপ্ত করার জন্য এই কাজগুলিকে চর্চা করা দরকার।

(পৃষ্ঠা নং- ৬৭)

কৃত্যালি যখন জ্ঞান গঠনের আবাসভূমি

শিক্ষা যেন হয় মুক্ত, শিক্ষা যেন হয় আনন্দের উৎস এবং প্রাত্যহিক জীবন নির্ভর। এক সময় ঠিক এমন শিক্ষারই স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। যেখানে শিক্ষা কোনভাবেই স্কুলের চার দেওয়ালের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। কবিগুরুর এই ভাবনাই যেন আবারও নতুন করে ফিরে এসেছে জাতীয় পাঠক্রম রূপরেখা, ২০০৫-এর হাত ধরে। ২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটির অন্তর্বর্তী রিপোর্টেও উঠে এসেছে সেই একই শিক্ষাদর্শনের কথা। তাই আজকের নতুন পাঠ্যসূচিও দাঁড়িয়ে এই শিক্ষা দর্শনের উপর, যার সারবস্তু হল, "To educated the hand as well as the head"- অর্থাৎ মানসিক বিকাশের পাশাপাশি আদর্শ শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, শৈশব থেকেই শিশুর সৃজন ও সৃষ্টিশীলতার বিকাশ ঘটানো। উচ্চ প্রাথমিক পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচিতে এর সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে, রয়েছে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য বেশ কিছু নির্দেশিকা। নানা ধরণের হাতের কাজ আর কর্মমূলক আনন্দপাঠই নতুন এই পাঠ্যসূচির মূল নির্যাস। এখানে পাঠ্যবই থেকে নির্বাচিত গ্রহণযোগ্য কিছু কৃত্যালি উল্লেখ করা হল, আমরা আশা রাখছি, আগামী দিনে শিক্ষক-শিক্ষিকারা যা অনুসরণ করে শৈশবকে ভিন্ন আঙ্গিকে বিকশিত করে শিক্ষায় নবদিশা দেখাবেন।

শ্রেণী – ৫ম

পুস্তকের নামঃ পাতাবাহার

১। গল্পবুড়ো – ছাত্র ছাত্রীরা মা, বাবা, ঠাকুর্দা, ঠাকুমা বা অঞ্চলের বড়দের কাছ থেকে স্থানীয় প্রচলিত গল্প শুনে ক্লাসে এসে অন্যদের শোনাবে।

২। ফণীমনসা ও বনের পরী (নাটক) – অঞ্চলে ফণীমনসা ও অন্য কাঁটাযুক্ত গাছ দেখবে ও চিনবে এবং ক্লাসে এসে যে সব গাছ চিনল তার তালিকা তৈরি করবে।

ছাত্র ছাত্রীরা নাটকটি অনুশীলন করবে ও বিভিন্ন সময়ে তা প্রদর্শন করবে। (স্কুলে বা এলাকায়)

৩। বোকা কুমিরের কথা – ছাত্র ছাত্রীরা বাড়ি ও আশপাশ ঘুরে দেখে মাটির নিচে হয় এমন কয়েকটি ফসলের সন্ধান করবে ও জানবে । এছাড়াও সাথে সাথে আর কি কি ফসল ঐ অঞ্চলে হয় সেটাও জেনে নেবে। তারপর স্কুলে এসে সবাই মিলে বসে কি কি জানল সেটা লিখবে।

৪। তাল নবমী – অঞ্চলে যারা তাল দিয়ে স্থানীয় খাবার তৈরি করতে পারে, সেইসব মানুষকে স্কুলে ডেকে এনে ছাত্র-ছাত্রীদের তালের খাবার তৈরি করা শেখানো হবে।

গ্রামে যেসব পরব বা অনুষ্ঠান হয়, সে বিষয়ে বড়দের কাছে শুনবে এবং স্কুলে এসে সেই সব উৎসব নিয়ে আলোচনা করে তার ছবি আঁকবে।

৫। একলা (কবিতা) – ছাত্র ছাত্রীরা বাড়ি থেকে স্কুলে আসার পথে বিভিন্ন গাছ-গাছালি দেখতে দেখতে আসবে। স্কুলে এসে ছাত্র-ছাত্রীরা একসাথে বসে কে কি গাছ দেখেছে ও কোন গাছ কি কাজে লাগে তা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সহায়তা নিয়ে লিপিবদ্ধ করবে।

পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীরা স্কুলে আসার সময় বিভিন্ন গাছের পাতা সংগ্রহ করে নিয়ে আসবে এবং খাতায় আটকাবে ও খাতায় আটকানো প্রতিটি গাছের পাতার নিচে গাছের নাম লিখবে।

পুস্তকের নামঃ আমাদের পরিবেশ

১। পরিবেশের উপাদান – ছাত্র-ছাত্রীরা তার নিজের এলাকায় কি কি উদ্ভিদ পাওয়া যায় সেটা বাড়ির বড়দের সাহায্য নিয়ে চিনবে। যেমনঃ জলের গাছ, ডাঙার গাছ, ফল ও ফুলের গাছ, বিষাক্ত গাছ, কাঠ পাওয়া যায় এমন গাছ, লতানো গাছ প্রভৃতি। তারপর স্কুলে এসে সবাই মিলে একসাথে বসে মাষ্টারমশাইদের সাহায্য নিয়ে বিভিন্ন রঙের পেন্সিল ব্যবহার করে তা লিপিবদ্ধ করবে।

২। পাখির মত উড়বো – ছাত্র ছাত্রীরা তাদের অঞ্চলে বিভিন্ন পাখির পালক সংগ্রহ করে খাতায় আটকাবে ও সেই পালকের নিচে লিখবে পাখির নাম এবং কোথা থেকে তা সংগ্রহ করা হয়েছে।

৩। বাড়ির কাছেই এত উদ্ভিদ – ছাত্র ছাত্রীরা বাড়ির আশেপাশে কি কি শাক হয় (যেমন – ব্রাহ্মী, কুলেখাড়া, ঢেকিশাক প্রভৃতি) সেগুলি দেখবে, চিনবে ও তার গুণাগুণ জানবে বাড়ির / অঞ্চলের বড়দের ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের থেকে এবং স্কুলে সবাই মিলে বসে খাতায় তা লিপিবদ্ধ করবে।

৪। স্থানীয় প্রাণী হারিয়ে যাওয়া – অঞ্চলের হাট পরিদর্শন করা ও দেখা সেখানে কি কি মাছ উঠছে। বাড়ির বড়দের কাছ থেকেও জানবে যে স্থানীয় অঞ্চলের পুকুরগুলিতে কি কি মাছ হয় এবং আগে কোন কোন মাছ পাওয়া যেত কিন্তু এখন পাওয়া যায় না। তারপর স্কুলে এসে সবাই মিলে আলোচনা করে যে মাছগুলি হারিয়ে গেছে সেগুলি আবার কিভাবে চাষ করা যায় তা নিয়ে আলোচনা করা ও হারিয়ে যাওয়া মাছগুলি খাতায় লিপিবদ্ধ করা।

৫. মাটি – ছাত্রছাত্রীরা তার নিজের অঞ্চলের নানা ধরণের মাটি সম্পর্কে বড়দের থেকে ধারণা নেবে ও জানবে কি কি ধরণের মাটি আছে এবং সেই মাটিতে কি কি গাছ হয় জানবে ও স্কুলে এসে সবাই মিলে মাষ্টারমশাইদের সহযোগিতায় তা লিপিবদ্ধ করবে।

স্থানীয় অঞ্চলে যদি কোনো বনাঞ্চল থাকে তাহলে সেখানে কি কি গাছ আছে সেটাও জানবে ও লিপিবদ্ধ করবে শিক্ষক শিক্ষিকাদের সহযোগিতায়।

৬। নদীতীরের সভ্যতা – অঞ্চলে যদি কোনো নদী থাকে তাহলে ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের এবং বাড়ির ও অঞ্চলের বড়দের থেকে সেই নদীর ইতিহাস জানবে। সেই নদীর ধারে কিভাবে ধীরে ধীরে জনপদ গড়ে উঠল তাও তারা জানবে এবং সেই নদীর ধারে যদি কোনো পুরানো মন্দির, মসজিদ, গড় ইত্যাদি থাকে তাহলে সেগুলিরও ইতিহাস জানবে ও দেখবে। তারপর ছাত্রছাত্রীরা স্কুলে বসে বা বাড়ি থেকে তারা যা জানতে পারল ও দেখল তা লিখে বা ছবি এঁকে আনবে, যার মাধ্যমে স্কুলে দেওয়াল পত্রিকা করা যাবে।

৭। লেখা নেই কাগজে, আছে শুধু মগজে –স্থানীয় এলাকায় বিভিন্ন বিষয়ে যে সমস্ত জ্ঞানী ব্যক্তি আছেন তাঁদের চিহ্নিত করা এবং ১-২ ঘন্টার জন্য তাঁদেরকে স্কুলে এনে তাঁর বিশেষ জ্ঞানটা ছাত্রছাত্রীদের ভিতর ছড়িয়ে দেওয়া। যেমনঃ গাছ-গাছড়ার গুণাগুণ সম্পর্কে ছাত্র ছাত্রীদের জানানো, নানা ধরণের হাতের কাজের ধারণা দেওয়া, এলাকার নানা গল্প বলা, তার জীবনের বিশেষ কোনো গল্প থাকলে সেটা বলা ইত্যাদি।

৮। জ্ঞান আর উৎসব – ছাত্রছাত্রীরা তাদের অঞ্চলে কি কি উৎসব বা পরব কি কি কারণে হয়, কি কি স্থানীয় নাচ, গান, নাটক হয় সেগুলি বাড়ির বড়দের বা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছ থেকে জানবে ও দেখবে এবং স্কুলে এসে সবাই মিলে বসে সেগুলির উপর লেখা লিখবে বা ছবি আঁকবে যেগুলি স্কুলের দেওয়াল পত্রিকাতেও থাকবে।

৯। স্মরণীয় যাঁরা – নবদিশায় যেসব গল্প প্রকাশিত হয়েছে সেগুলি শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছ থেকে ছাত্রছাত্রীরা শুনবে, রোল মডেলের ভিডিও দেখবে, নিজেদের অঞ্চলে যদি সেরকম ব্যক্তি থাকে তাহলে তাঁকে স্কুলে ডেকে এনে তাঁর জীবনের কথা শুনবে।

১০। পরিবেশ ও উৎপাদন (কৃষি ও মৎস্য) – স্থানীয় অঞ্চলে মরশুম ভিত্তিক কোন কোন ফসল চাষ হয়, সেগুলি চাষ করতে কি ধরণের জমি, মাটি, সার প্রভৃতি প্রয়োজন হয়, কিভাবে অঞ্চলে পুকুরগুলিতে স্থানীয়ভাবে মাছ চাষ করা হয় তা জানতে স্থানীয় অভিজ্ঞ চাষীদের স্কুলে ডেকে এনে তাঁদের কাছ থেকে শুনতে হবে এবং তাঁদের সহায়তা নিয়ে ছাত্রছাত্রীরা মাঠে গিয়ে দেখবে। তারপর ছাত্রছাত্রীরা এই অভিজ্ঞতা লিখবে ও আঁকবে যা তারা তাদের দেওয়াল পত্রিকাতেও প্রকাশ করবে।

১১। স্থানীয় বনখন্ড – স্থানীয় যদি বনাঞ্চল থাকে তাহলে তা পরিদর্শন করে কি কি গাছ আছে তা চিনতে হবে এবং গাছ ও বনের প্রয়োজনীয়তা জানতে হবে। চলচ্চিত্রের মাধ্যমে জানতে হবে কেন গাছ লাগানো দরকার।

শ্রেণী – ৬ষ্ঠ

পুস্তকঃ বাংলা সাহিত্য মেলা

- স্থানীয় অঞ্চল ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন গাছপালা দেখা এবং তার ভিত্তিতে চার্ট বানানো। চার্টে থাকবে গাছের নাম, গাছের আকার, কি ধরণের বা কি জাতীয় গাছ, গাছের পাতাগুলি কিরকম ইত্যাদি।

- আকাশ ভরা সূর্য তারা ... গানটি RP শেখাবে।

- বিভিন্ন পশু ও পাখির ছবি আঁকা। সেই সঙ্গে পশু পাখিদের নিয়ে বিভিন্ন রকম গল্প লেখা।

- স্থানীয় অঞ্চলে ধান ওঠার পর কি উৎসব হয়? সেই উৎসবের নামটি লিখতে হবে এবং সেই উৎসবটির বিষয়ে যতটুকু ধারণা আছে তা লিখতে বলা হবে।

- মাটি দিয়ে কিছু বানাতে হবে ... এক্ষেত্রে RP ছাত্র-ছাত্রীদের সহায়তা দেবে।

- স্থানীয় অঞ্চলে যদি আদিবাসীদের বসতি থাকে, তাহলে তাদের ঘর-বাড়ি কেমন তা দেখা এবং খাতায় বা আর্ট পেপারে তার ছবি আঁকতে বলা হবে।

- ছাত্র ছাত্রীরা দেওয়াল পত্রিকা বের করবে কিন্তু এক্ষেত্রে RP এবং শিক্ষক শিক্ষিকারা ছাত্র ছাত্রীদের সাহায্য করবেন। স্কুলের ভেতর কোনও দেওয়ালে এই পত্রিকা টাঙানো থাকবে এবং এই দেওয়াল পত্রিকা প্রতি তিনমাস অন্তর প্রকাশিত হবে।

- খবরের কাগজের কাটিং করতে বলা হবে। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ খবর তথা ছোটদের উপযোগী বিভিন্ন সংবাদ খবরের কাগজ থেকে কাটিং করে তা আর্ট পেপারে লাগাতে হবে বা এই বিষয়ক একটি খাতা তৈরি করবে ছাত্র ছাত্রীরা।

পুস্তকঃ পরিবেশ ও বিজ্ঞান

- অ্যাজোলা চাষ এবং অ্যাজোলার উপকারিতা নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে RP আলোচনা করবেন। কি ভাবে অ্যাজোলা চাষ করতে হয় তা নিয়ে RP হাতে কলমে ছাত্র ছাত্রীদের শেখাবেন।

- স্থানীয় কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে বা স্থানীয় অঞ্চলের কোথাও যদি অ্যাজোলার চাষ হয়ে থাকে, তাহলে ছাত্র ছাত্রীদেরকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে তা দেখাতে হবে।

- অ্যাজোলার চাষ নিয়ে LCD Show করা হবে এবং স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে হাতে কলমে ছোট করে অ্যাজোলা শেখানো হবে।

- ম্যালেরিয়া নিয়ে LCD Show করা হবে। এছাড়াও কৃমি,

মাছি প্রভৃতি বিষয় নিয়ে LCD Show করা হবে।

- রাসায়নিক সারের অপকারিতা এবং জৈব সারের উপকারিতা বিষয়ে RP এবং শিক্ষক শিক্ষিকারা আলোচনা করবেন।

- স্থানীয় অঞ্চলে চাষের জমিতে কি কি সার ও বিষ ব্যবহার করা হয় তা ছাত্র ছাত্রীরা স্বচক্ষে দেখবে। ছাত্রছাত্রীরা RPএর সাহায্য নিয়ে বিভিন্ন ধরণের জৈব সার ও কীটরোধক তৈরি করা শিখবে।

- স্থানীয় এলাকায় আগে কি কি মাছ পাওয়া যেত, এখন কি কি মাছ পাওয়া যায়, সে বিষয়ে ছাত্র ছাত্রীরা নিজেদের পরিবারের মধ্যে বড়দের কাছ থেকে জানবে এবং জেনে এসে তার একটা তালিকা তৈরি করবে।

- স্থানীয় হাটে গিয়ে ছাত্র ছাত্রীরা নিজেরা স্বচক্ষে দেখবে যে সেখানে এখন কি কি মাছ বিক্রি হয়।

- স্থানীয় এলাকায় বা স্কুলের পাশের মাঠে বীজ তলা কিভাবে তৈরি হয়, তা ছাত্র ছাত্রীরা নিজেরা গিয়ে দেখবে। কিভাবে চারা গাছ জমিতে রোয়া হয় তাও তারা নিজের চোখে দেখবে।

- RPএর সাহায্য নিয়ে ছাত্র ছাত্রীরা SRI পদ্ধতি বিষয়ে জানবে ও শিখবে।

- RP এবং আশা বা ANM কর্মীদের সাহায্যে ছাত্র ছাত্রীরা BMIএর মাধ্যমে কিভাবে পুষ্টি ম্যাপিং করা হয় তা শিখবে।

- RPএর সাহায্যে ছাত্র ছাত্রীরা জমি পরিমাপ করতে শিখবে।

- অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে কিভাবে জীবাণু দেখা হয়, সেটা শিক্ষক শিক্ষিকা ও RPএর সাহায্যে ছাত্র ছাত্রীরা শিখবে।

- ভিডিও-র মাধ্যমে ক্লাসে বিভিন্ন সাপের ছবি দেখানো হবে। এই ছবির মাধ্যমে ছাত্র ছাত্রীরা বিভিন্ন ধরণের সাপ বিষয়ে জানবে। শুধু তাই নয়, কোন কোন সাপের বিষ আছে, কোন কোন সাপের বিষ নেই এবং কোন সাপ কোথায় থাকে ইত্যাদি নানা বিষয়ে তাদের ধারণা তৈরি হবে।

- বাড়ি থেকে ফেলে দেওয়া বিভিন্ন জিনিসপত্রের সাহায্যে কিভাবে নতুন নতুন জিনিসপত্র তৈরি করা যায় তা ছাত্র ছাত্রীরা শিখবে। RPএর সাহায্যে তারা এই ধরণের হাতের কাজ শিখবে। যেমন পুরনো প্লাস্টিক দিয়ে খেলনা তৈরি করা, পুরনো কাগজ দিয়ে কিছু বানানো, পুরনো ছেঁড়া কাপড়ের উপর সুতো দিয়ে নকশা তৈরি করা।

পুস্তকঃ ইতিহাস

স্থানীয় ঐতিহাসিক স্থানে ছাত্র ছাত্রীদের ভ্রমণে নিয়ে যেতে হবে।

ভ্রমণ করে এসে সেই স্থান সম্বন্ধে ছাত্র ছাত্রীরা নিজেদের অভিজ্ঞতা লিখবে বা সেই স্থানের দর্শনীয় কোনও বস্তু বা পুরনো কোনও স্থাপত্য তাদের যা ভাল লেগেছে তা নিয়ে ছবি আঁকবে।

- ছাত্রছাত্রীদের সামনে গৌতম বুদ্ধকে নিয়ে LCD Show করা হবে।

- জাতকের গল্পকে অভিনয়ের মধ্য দিয়ে দেখানো হবে ও LCD Show করা হবে এবং নীতিকথা নিয়ে আলোচনা হবে।

স্বাস্থ্য ও শরীর শিক্ষা

- LCD Show এর মাধ্যমে ছাত্র ছাত্রীদের স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতন করা হবে। এই স্বাস্থ্য সচেতনতার মধ্যে যে যে বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেওয়া হবে, সেগুলি হলঃ ব্যক্তিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, বিশুদ্ধ জলের ব্যবহার ইত্যাদি।

শ্রেণী – ৭ম

পুস্তকঃ বাংলা

১। স্থানীয় অঞ্চলের নিজস্ব যে ট্র্যাডিশনাল সঙ্গীত রয়েছে এবং স্থানীয় অঞ্চলে সেই ধরণের যে সব সঙ্গীত শিল্পী রয়েছেন, তাঁদের স্কুলে নিয়ে আসতে হবে এবং তাঁদেরকে দিয়ে ছাত্র ছাত্রীদের সামনে গান শোনানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

২। ছাত্র ছাত্রীদের বিভিন্ন ধরণের হাতের কাজ শেখানো হবে। এক্ষেত্রে RP বা শিক্ষক শিক্ষিকাদের সহায়তা নেওয়া হবে।

পুস্তকঃ পরিবেশ ও বিজ্ঞান

১। স্থানীয় অঞ্চলের খাদ্যাভাস অনুযায়ী ছাত্র ছাত্রীরা একটি খাদ্য তালিকা তৈরি করবে।

২। বিভিন্ন রোগ থেকে দূরে থাকতে হলে বা শরীরে পুষ্টি বজায় রাখতে হলে খাদ্য তালিকায় কি কি ধরণের খাদ্য রাখতে হবে তা নিয়ে আলোচনা করতে হবে। সেই সঙ্গে খাদ্যের কোন কোন উপাদানের অভাবে রোগ বা অপুষ্টি দেখা দিতে পারে, সে বিষয়ে আলোচনা করা হবে।

৩। বিভিন্ন রোগ বা অপুষ্টির কারণগুলি নিয়ে LCD Show করা হবে।

৪। BMIএর মাধ্যমে কিভাবে অপুষ্টি নির্ণয় করা যায়, ছাত্র ছাত্রীদের তা শেখানো হবে।

৫। অপুষ্টির শিকার হলে পুষ্টি রয়েছে এমনসব শাকসব্জি ও ফলের বিষয়ে ছাত্রছাত্রীদের জানানো হবে এবং সেই সব শাকসব্জির বীজ দিয়ে তাদেরকে তা নিজেদের বাড়িতে লাগানোর কথা বলা হবে।

৬। ANM ও ASHA কর্মীদের বা আয়ুশ ডাক্তারদের স্কুলে নিয়ে এসে ছাত্র ছাত্রীদের অভিভাবক তথা বাবা মা দের অপুষ্টি বিষয়ে সঠিক ধারণা গড়ে তোলা হবে।

৭। পাতা - বিভিন্ন পাতার নমুনা ছাত্রছাত্রীরা সংগ্রহ করে খাতায় আটকাবে এবং সেটা কোন গাছের পাতা তা লিখবে।

এইভাবে স্থানীয় অঞ্চলের গাছের সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করবে ছাত্রছাত্রীরা।

৮। বীজ - ছাত্র ছাত্রীরা স্থানীয় অঞ্চল থেকে বিভিন্ন রকম বীজ সংগ্রহ করবে। তারপর স্কুলে অঞ্চলের অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সহযোগিতায় তারা বীজ সংরক্ষণ শিখবে।

৯। পরিবেশ রক্ষায় গাছঃ বিশ্ব উষ্ণায়ন নিয়ে চলচ্চিত্র দেখানো হবে ও এই বিষয় আলোচনা করা হবে এবং ছাত্রছাত্রীদের গাছ লাগানো বিষয় উৎসাহ দিতে হবে। পরবর্তী ধাপে ছাত্রছাত্রীদের মাধ্যমে স্কুলে নানারকম গাছের নার্সারি গড়ে উঠবে ও চারা তৈরি হবার পর কিছু চারা স্কুলে লাগাবে ছাত্রছাত্রীরা এবং কিছু চারা বাড়িতে ও বাড়ির আশেপাশে লাগাবে।

১০। সংক্রামক রোগ ও তার প্রতিকারঃ মশা, মাছি, কৃমি প্রভৃতি নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের চলচ্চিত্র দেখানো হবে এবং দেখানোর পর তা নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের সাথে আলোচনা করতে হবে ও বাড়িতে জানাতে বলতে হবে এবং নিয়ম–নীতি মেনে চলতে হবে।

পুস্তকঃ স্বাস্থ্য ও শরীরশিক্ষা

১। অপুষ্টি নিয়ে ছাত্র ছাত্রী ও অভিভাবকদের নিয়ে আলোচনা করা।

২। বি-এম-আই করানো।

৩। বি-এম-আই হয়ে যাবার পরে এ-এন-এম, আয়ুষ, আশা এদেরকে স্কুলে এনে অভিভাবক ও স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের যুক্ত করে সকলের সাথে পুষ্টি নিয়ে আলোচনা এবং সকলের সামনে স্কুলের পুষ্টি বাগান ও ফল গাছের নার্সারির গুরুত্ব তুলে ধরা।

৪। স্থানীয় অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সহযোগিতায় ছাত্র ছাত্রীদের ব্রতচারী ও যোগাসন শেখানো এবং কোন যোগাসনের কি গুরুত্ব তা ছাত্রছাত্রীদের সাথে আলোচনা করা।

৫। প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ছাত্র ছাত্রীদের ভ্রমণ করানো ও ডাক্তারদের সাথে ছাত্রছাত্রীদের পরিচিত হওয়া।

পুস্তকঃ ইতিহাস

১। স্কুলে শিক্ষক-শিক্ষিকারা ছাত্র ছাত্রীদের পঞ্চায়েত সম্বন্ধে প্রাথমিক পরিচিতি দেবে। তারপর শিক্ষক-শিক্ষিকারা একদিন ছাত্রছাত্রীদের স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতে নিয়ে যাবে এবং প্রধান, উপপ্রধানসহ অন্যান্য পঞ্চায়েত কর্মী ও সদস্যদের সাথে ছাত্রছাত্রীরা পরিচিত হবে ও কাদের কি কাজ তাঁদের থেকে শুনবে । চলচ্চিত্রের মাধ্যমে গ্রাম পঞ্চায়েতের সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের প্রাথমিক ধারণা দেওয়া হবে।

২। অঞ্চলে যদি কোন ঐতিহাসিক স্থান থাকে তাহলে শিক্ষক-শিক্ষিকারা নিজেরা বা অঞ্চলের অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের দিয়ে সেইসব স্থানের মাহাত্ম্য ছাত্রছাত্রীদের জানাবে, তারপর গ্রাম পঞ্চায়েতের সহযোগিতায় ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে সেখানে ভ্রমণ করানো হবে। পরে ছাত্র ছাত্রীরা স্কুলে বসে তাদের ভ্রমণের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করবে বা ভ্রমণের ছবি আঁকবে যেগুলি স্কুলের দেওয়াল পত্রিকায় প্রকাশিত হবে।

৩। শিক্ষক-শিক্ষিকারা নিজেরা বা স্থানীয় বয়স্ক ব্যক্তিদের স্কুলে এনে স্থানীয় অঞ্চলের যদি কোনো ঐতিহাসিক গুরুত্ব থাকে তা ছাত্র ছাত্রীদের জানাবেন। সেই ঐতিহাসিক গল্প শুনে ছাত্র ছাত্রীরা সেগুলি পরে স্কুলে বসে লিখবে। যার লেখা ভালো হবে তাকে স্কুল থেকে পুরস্কৃত করতে পারে এবং তার লেখা স্কুলের দেওয়াল পত্রিকায় স্থান পাবে।

৪। বিভিন্ন মনিষী ও সাধকদের জীবনী শিক্ষক-শিক্ষিকারা ছাত্র ছাত্রীদের সামনে তুলে ধরবেন ও ছাত্রছাত্রীদের উজ্জীবিত করার চেষ্টা করবেন। যেমনঃ লালন, কবীর, নানক, হাসান রাজা, কাঙাল রাজা প্রভৃতি।

শ্রেণী – ৮ম

পুস্তকঃ বাংলা

১। বন্ধুত্ব ও সহানুভূতি - গান শেখানো ও নাটক করা।

২। গল্পের নামঃ গাছের কথা – নানা রকম বীজের পরিচিতি, বীজের খোসা তুলে দেখানো কোন অংশ থেকে গাছ বার হয়।

পুস্তকঃ পরিবেশ ও বিজ্ঞান

১। খরিফ ও রবিতে কি কি চাষ হয় সেটা কৃষকদের থেকে জানবে ও একটা আর্ট পেপারে ছাত্র ছাত্রীরা ছবিসহ তা লিখে ক্লাস ঘরে টাঙাবে।

২। হাতে কলমে ছাত্র ছাত্রীরা শিখবে কিভাবে সুস্থ বীজ চিহ্নিত করা যায়।

৩। ছাত্র ছাত্রীরা জৈব সার (ভার্মি, অ্যাজোলা ইত্যাদি) কিভাবে করা যায় তা হাতে কলমে শিখবে এবং রাসায়নিক সারের অপকারিতা জানবে ও তারা একটা লেখা তৈরি করবে যা ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের তৈরি দেওয়াল পত্রিকাতে দিতে পারে।

৪। ছাত্র ছাত্রীরা হাতে কলমে জৈব কীটরোধক তৈরি করা শিখবে।

৫। ছাত্র ছাত্রীরা জানবে কিভাবে উন্নতজাতের আর-আই-আর মুরগি পালন করা যায় ও কিভাবে আর-আই-আর মুরগির ডিম ফুটিয়ে বাচ্চা তোলা যায়। যদি কাছাকাছি স্থানীয় ভাবে কেউ আর-আই-আর মুরগি পালন করে এবং আর-আই-আর মুরগির ডিম ফুটিয়ে বাচ্চা তোলে তাহলে ছাত্রছাত্রীরা সেখানে গিয়ে পরিদর্শন করবে।

৬। বদ্ধ জলাশয়ে গ্রামাঞ্চলে স্থানীয়ভাবে কিভাবে মাছের ডিম ফোটানো হয় সেটা ছাত্র ছাত্রীরা জানবে। স্থানীয় এলাকায়

এই পদ্ধতিতে যদি কেউ মাছের ডিম ফোটায় তাহলে ছাত্র ছাত্রীরা সেখানে গিয়ে তা দেখবে ও হাতে কলমে শিখবে।

৭। ছাত্রছাত্রীরা চলচ্চিত্রের মাধ্যমে বিশ্ব উষ্ণায়ন নিয়ে জানবে এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছ থেকে বিশ্ব উষ্ণায়ন নিয়ে ধারণা পাবে এবং তারা স্কুলে, বাড়িতে ও নিজেদের অঞ্চলে গাছ লাগাবে ও দেখভাল করবে।

৮। অঞ্চলে স্থানীয়ভাবে কত ধরণের বাঁশ পাওয়া যায় সেটা ছাত্র ছাত্রীরা শিক্ষক-শিক্ষিকা ও বাড়ির বড়দের থেকে জানবে, বাঁশ দিয়ে যদি কিছু তৈরি হয় সেগুলিও জানবে এবং সেই কারিগরকে স্কুলে এনে কিভাবে সেগুলি তৈরি করা হয় সেগুলি শেখার চেষ্টা করবে ও ধারণা গড়ে তুলবে। সেই সঙ্গে শিখবে কিভাবে খুব সহজেই বাঁশের ডাল কেটে চারা তৈরি করা যায়।

৯। ছাত্র ছাত্রীরা স্থানীয় হাটে ভ্রমণ করে ও অঞ্চল থেকে জানবে কি কি মশলা পাওয়া যায়। পরে স্কুলে এসে সবাই মিলে একসাথে বসে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ও স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের থেকে জানবে কোন মশলার কি উপযোগিতা। পরে স্কুলের বাগানে অল্প করে মশলার চাষ করা শিখবে।

১০। ছাত্র ছাত্রীরা শিক্ষক-শিক্ষিকা ও বাড়ির বড়দের থেকে জানবে ও লিপিবদ্ধ করবে যে অঞ্চলে কি কি ধরণের ওষধি গাছ পাওয়া যায়, তারপর তারা সেগুলি পরিদর্শন করবে এবং অভিজ্ঞ মানুষদের কাছ থেকে তার কি কি গুণ রয়েছে তা জানবে। স্কুলেও কিছু কিছু ওষধি গাছ তারা লাগাবে এবং তার ব্যবহারও তারা শিখবে।

১১। ধান চাষ – ছাত্র ছাত্রীরা জানবে অঞ্চলে এখন কি কি ধরণের ধান চাষ হয়, আগে কি ধরণের হত, যে ধানগুলো আগে হত কিন্তু এখন হয় না সেগুলো কেন এখন হয় না। এইসবকিছু জানার পর তারা নিজেরা একসাথে স্কুলে বসে খাতায় লিপিবদ্ধ করবে এর পাশাপাশি স্থানীয় অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের থেকে জানার চেষ্টা করবে নতুন কোনো ধান চাষের পদ্ধতি আছে কিনা যদি থাকে তাহলে কিভাবে সেই পদ্ধতির মাধ্যমে চাষ করা হয়।

পুস্তকঃ ইতিহাস

১। স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাহায্য নিয়ে স্থানীয় অঞ্চলে কিভাবে জমি মাপা হয় সেটা হাতে কলমে শিখবে।

২। শিক্ষা নিয়ে যাঁরা চিন্তা ভাবনা করেন সেইসব বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে নবদিশাতে যে লেখা প্রকাশিত হয় সেগুলি শিক্ষক-শিক্ষিকারা ছাত্রছাত্রীদের পাঠ করে শোনাবেন এবং তার মাহাত্ম্য বোঝাবেন ।

৩। পঞ্চায়েত সম্বন্ধে স্কুলে শিক্ষক-শিক্ষিকারা ছাত্রছাত্রীদের প্রাথমিক পরিচিতি দেবেন এবং পঞ্চায়েত ভ্রমণ ও চলচ্চিত্রের মাধ্যমে গ্রাম পঞ্চায়েতের সম্পর্কে ছাত্র ছাত্রীদের প্রাথমিক ধারণা দেওয়া হবে। প্রাথমিক ভাবে ছাত্র ছাত্রীদের বোঝানো হবে এই স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন ব্যবস্থার গুরুত্ব।

পুস্তকঃ ভূগোল

১। সাপ – অঞ্চলে কি কি ধরণের সাপ দেখা যায় তা শিক্ষক-শিক্ষিকা ও বাড়ির বড়দের থেকে ছাত্র ছাত্রীরা জানবে। এর মধ্যে কোন সাপ বিষযুক্ত ও বিষহীন এবং সাপে কামড়ালে প্রাথমিকভাবে কি কি করতে হয় তাও শিখবে। চলচ্চিত্রের মাধ্যমেও সাপ সম্পর্কে ধারণা পাবে ছাত্রছাত্রীরা।

২। শিক্ষক-শিক্ষিকা ও বাড়ির বড়দের সাহায্যে ছাত্র ছাত্রীরা নিজের অঞ্চলের নানা জাতি, উপজাতিদের একটি তালিকা তৈরি করবে যেখানে সেইসব জাতি উপজাতিদের প্রধান ভাষা, খাদ্যভ্যাস, প্রধান পোষাকের নাম, প্রধান প্রধান পরব ও অনুষ্ঠানের কথাও থাকবে।

৩। শিক্ষক-শিক্ষিকা, অঞ্চলের অভিজ্ঞ ব্যক্তি ও বাড়ির বড়দের সাহায্য নিয়ে ছাত্র ছাত্রীরা পর্ণমোচী, চিরহরিৎ প্রভৃতি নানা ভাগ সম্পর্কে জানবে এবং স্থানীয় অঞ্চলে যেসব বৃক্ষ দেখা যায় তার নামের তালিকা তৈরি করে কোন গাছ কোন শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত হয় তার বিভাজন করবে।

পুস্তকঃ স্বাস্থ্য ও শরীরশিক্ষা

১। অপুষ্টি নিয়ে ছাত্র ছাত্রী ও অভিভাবকদের নিয়ে আলোচনা করা।

২। বি-এম-আই করানো।

৩। বি এম আই হয়ে যাবার পর এ-এন-এম, আয়ুষ, আশা এদেরকে স্কুলে এনে অভিভাবক ও স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সকলের সাথে পুষ্টি নিয়ে আলোচনা এবং সকলের সামনে স্কুলের পুষ্টি বাগান ও ফল গাছের নার্সারির গুরুত্ব তুলে ধরা।

৪। স্থানীয় অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সহযোগিতায় ছাত্র ছাত্রীদের ব্রতচারী ও যোগাসন শেখানো এবং কোন যোগাসনের কি গুরুত্ব তা ছাত্র ছাত্রীদের সাথে আলোচনা করা।

নবদিশা-র সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে রবি রায় কর্তৃক ৫/১/২/ জি, কর্ণফিল্ড রোড, কলকাতা – ৭০০ ০১৯ থেকে প্রকাশিত ও শান্তি মূদ্রণ, ৩২/৩ পটুয়াতলা লেন, কলকাতা – ৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত

FOR PRIVATE CIRCULATION ONLY

নবদিশা ভাবনা

- গ্রাম বাংলার শিক্ষাঙ্গনে প্রচলিত শিক্ষার পাশাপাশি আঞ্চলিক জীবনযাপন-নির্ভর শিক্ষার সংযোজিত প্রচেষ্টা।
- আঞ্চলিক জ্ঞান ও সংস্কৃতিই হবে সংযোজিত শিক্ষার মূল ভিত্তি।
- এর বাস্তব রূপায়ণে সাধারণ মানুষের স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসিত সরকার একটা উল্লেখযোগ্য অবদানের দিশারী হবে।

নবদিশার পথিক হন

শিক্ষাঙ্গনে নতুন দিশার খোঁজে শিক্ষক এবং শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত মানুষজন তাঁদের চিন্তা – অভিজ্ঞতা বিনিময় করার মঞ্চ হল এই নবদিশা পত্রিকা।

আমরা আশা করি আপনাদের মতামত, শিক্ষা নিয়ে নতুন চিন্তাভাবনা এবং ছেলেমেয়েদের নিয়ে সাধারণ পাঠক্রমের বাইরে কাজ করার অভিজ্ঞতা নবদিশা পত্রিকার মাধ্যমে বিনিময় হবে।

জানার জন্য, শেখার জন্য ও জানানোর জন্য।

আসুন, পথিক হন।

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ AHEAD Initiatives

৫/১/২/জি কর্নফিল্ড রোড (বালিগঞ্জ), কলিকাতা- ৭০০০১৯ টেলিফোন নং ঃ ৬৫২২১০৯৭